বিপাশা

শ্রীমান রমাপদ চৌধুরী

কল্যাণীয়েষু

বরাকর নদের উপর মাইথন ড্যামের ঠিক মাঝখানে একলা চুপচাপ বসে ছিল একটি মেয়ে। স্তব্ধ নিশ্চল একটি মূর্তির মত। মেয়েটির রূপ অপরূপ কিনা সে বিষয়ে মতভেদ নিশ্চয় হবে, কিন্তু তার রূপটি যে এই দেশের মানুষের পক্ষে বিস্ময়কর তাতে সংশয় নেই। বরাকরের মাইথন ড্যামের একদিকে বেহার, অন্যদিকে বাংলা। শ্যাম রূপের দেশে এ মেয়ের গায়ের রঙ শুভ্র—চোখের রঙ পিঙ্গল—চুল স্বর্ণাভ। একসময়, অর্থাৎ শৈশবে ও বাল্যে নিশ্চয় একেবারে স্বর্ণাভ বা শুভ্রাভ ছিল—দিনে দিনে বয়সের সঙ্গে কালো হয়ে এসেও পুরো কালো হয়নি, আলো পড়লে পিঙ্গলাভা বা স্বর্ণাভা স্পষ্ট হয়ে যেন ঠিকরে পড়ে। বাংলাদেশে পিঙ্গল রূপকে চলতি ভাষায় বলে কটা রূপ। কটা শব্দের মানে এখানে কড়া। এ রূপ মানুষকে মুগ্ধ কতখানি করে, তা হয়তো মানুষের রুচির উপর নির্ভর করে, কিন্তু একশো মানুষের দুশো চোখ—নিশ্চয় তার উপর নিবদ্ধ হবে, এবং বিস্ময় একটু জাগবেই। ভাববে এ কি এদেশের মেয়ে? একটু যেন ভয়ও হয় এ রূপে। যাঁরা মানুষের ইতিহাসে কৌতূহলী, তাঁরা মনশ্চক্ষে দেখবেন। রক্তকণিকায় এবং প্রাণ-কণিকার মধ্যে সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছে শীতপ্রধান শুভ্রদেশ ইওরোপের স্পর্শ।

মেয়েটির নাম বিপাশা। পাঞ্জাবের নদী বিপাশা। পাঞ্জাবে জন্ম—বাপ বাঙালী, মা পাঞ্জাবী। কিন্তু তাতেও প্রশ্ন মেটে না। পাঞ্জাবের পক্ষেও এ রঙ, এ চোখ, এ চুল একটু উগ্র। পাঞ্চেৎ এলাকায় মিশনারীদের পরিচালিত জেনানা মিশনে কাজ শিখতে এসেছে। ভারত সরকারের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের কর্মী—এখানে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কাজ শিখছে। একটু দীর্ঘাঙ্গী—দেহখানি শীর্ণ মনে হয়। প্রাণচাঞ্চল্য এবং রূপের মতই একটু উগ্র প্রকৃতির মেয়ে। এমনভাবে একলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার তার কথা নয়। তার পক্ষে অস্বাভাবিক।

বিপাশা ভাবছিল, তার নাম বিপাশা না হয়ে দময়ন্তী হলেই যেন ভাল হত। দেবতাদের উপেক্ষা করে দময়ন্তী মানুষ-রাজা নলকে বরণ করেছিল। রাজ্য হারিয়ে হৃতসর্বস্ব হয়ে নল বনে গেলে দময়ন্তী পিতৃগৃহে ফিরে যায়নি—ছেলেদের সেখানে রেখে সে নলকেই অনুসরণ করেছিল। স্বামীর সঙ্গে একখানা কাপড় দুজনে ভাগ করে পরে বেড়াচ্ছিল। সেই নল, দময়ন্তীর ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে ছুরি দিয়ে কাপড়খানাকে কেটে তাকে গভীর বনের মধ্যে ফেলে পালিয়েছিল। হায় পুরুষ!

দিব্যেন্দু তাকে যেন ঠিক তেমনি করেই ফেলে গেল। দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী—এখানকার অ্যাসিস্টাণ্ট এঞ্জিনীয়ার—তার জীবনের প্রিয়তম আগন্তুক।

অত্যন্ত অকস্মাৎ ঠিক নলের মতই কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে। সে এক মাস আগের কথা। সেদিন বিকেলে পাঞ্চেতে দামোদরের ধারে নির্দিষ্ট শিলাখণ্ডটির উপর বসে থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিব্যেন্দু এল না দেখে ফিরে এসেছিল। ভেবেছিল বোধহয় কাজে আটকে পড়েছে। দ্বিতীয় দিনও আসেনি। তৃতীয় দিন সে নিজে এসেছিল মাইথন। এসে দেখেছিল দিব্যেন্দু নেই। শুনেছিল—দিব্যেন্দু কোনো চিঠি পেয়ে আপিস থেকেই ছুটির দরখাস্ত দিয়ে চলে গিয়েছে। দরখাস্ত মঞ্জুর হবে কি হবে না ভাবেনি, কোনো কারণ দেখায় নি, শুধু লিখেছিল অত্যন্ত জরুরী পারিবারিক প্রয়োজনে এই মুহূর্তেই তাকে যেতে হচ্ছে। এবং

প্রায় ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই অল্প কিছু জিনিসপত্র নিয়ে সে চলে গিয়েছে। কোথায় যাচ্ছে, কবে নাগাদ ফিরবে এ কথাও কেউ বলতে পারে নি। কারণ ভর্তি আপিসের সময় সেটা। আপিসের কাউকে কিছু বলে নি, তার কোয়ার্টারের চাকরটাকেও কিছু বলে নি, বিপাশা থাকে পাঞ্চেতে, তাকে বলবারও বোধ হয় সুযোগ হয়নি। সেদিন তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু থাকলেও কি সে তাকে জানাতো? আজ সন্দেহ হচ্ছে, বিপাশার দৃঢ় সন্দেহ, সে জানাতো না। জানাবার অভি-প্রায় থাকলে একখানা চিঠি—অন্তত একখানা চিরকুটের মত চিঠিও সে রেখে যেতে পারত। অবশ্য হতে পারে যে, দুঃসংবাদটি খুবই গুরুতর ছিল, যাতে ধৈর্য বা মনের বল সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল।

বিপাশা চিন্তিত হয়েছিল। কিন্তু তারও তো খোঁজ করবার কোন উপায় ছিল না। কোথায় গেছে দিব্যেন্দু, কেমন করে জানবে? এবং সেই দিন সে প্রথম নিজের নির্বুদ্ধিতার, অল্প বয়সের আবেগাচ্ছন্ন অদূরদর্শিতার জন্য নিজের কাছে লজ্জা পেয়েছিল এবং নিজেকে সেজন্যে তিরস্কার করেছিল। দিব্যেন্দুর কোন ঠিকানাই সে জানে না! অথচ তার সব কথাই তো সে জানে, দিব্যেন্দু তো তাকে গল্পচ্ছলে সবই বলেছে!

বলেছিল—তোমার সঙ্গে আমার খুব মিল আছে বিয়াস। আমরা ছেলে বয়স থেকেই পিতৃমাতৃহীন। তোমার তবু মা-বাপকে মনে পড়ে, আমার তাও না। তবে তার পরের দুর্ভোগ তোমার থেকে আমার কম।

দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী—বাপ ছিলেন এঞ্জিনীয়ার। এখানে পাস করেই বিয়ে করেছিলেন তার মাকে এবং তারপর পড়তে যান বিলেতে। সেই বিলেতেই তিনি মারা যান। মা ছিলেন মাতামহের কাছে। মাতামহ মাতামহী ছিলেন বিচিত্র মানুষ। সরকারী চাকুরে ছিলেন মাতামহ। নেহাৎ ছোট চাকরি নয়। অফিসার গ্রেডের চাকুরে। চাকরিজীবনে ছিলেন সাহেব। তার মা ছিলেন তাঁদের সবকনিষ্ঠ সন্তান। তাঁর উপরে ছিলেন দুটি ছেলে। তাঁরা আজও আছেন। বাবার চেয়েও তাঁরা কড়াতর সাহেব। সরকারী অফিসারের ছেলে—লেখাপড়াও শিখেছিলেন। চাকরিও পেয়েছিলেন। একজন রেলে—একজন তেলের কোম্পানীতে। স্ত্রী নিয়ে চাকরির স্থানে স্থানে ঘুরতেন। চাকরিতে তাঁদের ঘুরতে হত গোটা দেশ চষে। মায়ের সঙ্গে বধূদের মিল ছিল না।

দিব্যেন্দু বলেছিল—জান, আমার দিদিমাই আমাকে মানুষ করেছেন। আমার মা আমাকে পাঁচ বছরের রেখে মারা যান। অফুরন্ত তাঁর স্নেহ। তবু এ কথা স্বীকার করব যে, মামীদের আমার কত দোষ—তা বলতে পারব না, কিন্তু দিদিমা তাদের মাথা না খেয়ে কোনো দিন জল খেতেন না। ওঃ; সে কি বাঁধুনী! হাসত দিব্যেন্দু সে-সব কথা স্মরণ করে। এবং তারপরই বলত, সে কি আমিই বাদ যেতাম! আমাকেও গাল দিতেন। অলক্ষুণে, অতুতক্ষুণে! মা-খেগো, বাবা-খেগো। বাপে-তাড়ানো, মায়ে-হারানো হারামজাদা! আমাদের দুটোকে খা না। খেলেই চোকে। তোর জন্যেই, ওরে তোর জন্যেই আমার এত যন্ত্রণা!

কথাটা অবশ্য আংশিকভাবে সত্য, তাও দিব্যেন্দু স্বীকার করত। কারণ মাতামহ এবং

মাতামহীর সঙ্গে তাঁদের ছেলে-বউদের যে গরমিল ছিল, সেটা একটা কলহে এবং বিচ্ছেদজনক মনান্তরে পরিণত হয়েছিল তার মাকে নিয়ে এবং তাকে নিয়ে, তার বাপের মৃত্যু-সংবাদ এলে। সম্ভবত মাতামহ এবং মাতামহী তার মা এবং তাকেই তাঁদের উত্তরাধিকারী বলে একটা উইল করেছিলেন। এবং তাদের নিয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে এসেছিলেন কাশী। চাকরিতে পেনসন হতে তখনও কিছুদিন বাকী ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি ডাক্তারের সার্টিফিকেট যোগাড় করে রিটায়ার করে চলে এসেছিলেন কাশী। কাশীতে বাড়ি ভাড়া করে সেখানেই ছিলেন তাদের নিয়ে, এবং সাহেবদের আশ্রয় এবং অনুকরণ ছেড়ে দেবতাকে আশ্রয় এবং পূজা করে শান্তি পেতে চেয়েছিলেন।

দিব্যেন্দু বলত—তা ফল পেয়েছিলেন বইকি! বিধবা মেয়ের মুখ বেশী দিন দেখতে হয়নি। বছর তিনেকের মধ্যেই তার মা বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন।

মায়ের মৃত্যুর পর মানুষ করেছিলেন দিদিমা। দিদিমা মামাদের গাল দিতেন, মামীদের মাথা খেতেন, দিব্যেন্দুর বাপের আদ্যশ্রাদ্ধ করতেন—মায়ের বেলায় জ্ঞান হারাতেন। দিব্যেন্দুর মরা মাকেও মর-মর-মর বলে অভিসম্পাত দিতেন। দিব্যেন্দুকে কথাই নেই। অবশ্য আদরও করতেন—বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতেন।

মামাদের সে একবার মাত্র চোখে দেখেছে। সে তার মাতামহের মৃত্যুর পর। তখন দিব্যেন্দু কাশী থেকে ম্যাট্রিক পাস করে সবে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছে। তখন মামারা এসেছিলেন—শ্রাদ্ধ করতে। মামীরা বা তাঁদের ছেলেমেয়েরা আসেন নি। তার আগে, মাতামহী তাকে দিয়ে তিন দিনে একটা শ্রাদ্ধ করিয়েছেন। মামারা পদার্পণ মাত্রেই সেই সংবাদ পেয়ে শুরু করেছিলেন তাঁদের মায়ের সঙ্গে ঝগড়া।

—কেন তুমি তা করালে? কেন?

দিদিমা বলেছিলেন—বেশ করেছি। তিনি বলে গেছেন।

—তিনি বললেও এ হয় না—হতে পারে না। আমরা আসব—শ্রাদ্ধ করব।

—সে তোমরা করতে পার! নিজের নিজের খরচে করগে!

—নিশ্চয় করব। এই অনাচার—এ সহ্য করব না। শ্রাদ্ধে বিশ্বাস করি চাই না-করি, দেশাচার হিসেবে—করব। শাস্ত্র যদি সত্য হয় তবে তিনি নিজের নরক গমনের দ্বার প্রশস্ত করেছেন ওর পিণ্ড নিয়ে—আমরা পিণ্ড দিয়ে যতটুকু প্রতিকার হয় তা করব।

তা তাঁরা করেছিলেন। এবং যে কয়েকটি দিন ছিলেন—দিন রাত্রি ধরে মায়ের সঙ্গে পুরনো ঝগড়ার মরচেপড়া, ময়লাধরা ছুরি বা ছোরা বঁটি যাই হোক সেটা—সেটাতে শান দিয়ে ঘষে ঝকমকে এবং ধারালো করে নিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। দিব্যেন্দু এর মধ্যে মাথা গলায়নি। বাড়ি থেকে সে সরেই গিয়েছিল। প্রথম দিনই একটা কাণ্ড ঘটেছিল। যা ঘটেছিল কাণ্ড ছাড়া তা আর কি? মামারা দুই ভাই রাত্রে দুধ-মিষ্টি খেয়ে জল খুঁজছিলেন। জল নিতে তাঁরা ভুলেছিলেন, দিদিমাও দেন নি, সে পাশের ঘরটায় ছিল; মামাদের জল চাই বুঝে সে-ই জল গড়িয়ে তাঁদের কাছে যেতেই তাঁরা বলেছিলেন—তোমাকে কে জল আনতে বললে?

বড়মামা হাতের জলপাত্রটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন—গেট আউট ফ্রম হিয়ার। পাপ, একটা পাপ!

দিব্যেন্দু আহত হয়ে চলে এসেছিল এবং দিদিমাকে জাগিয়ে তুলে বলেছিল—দি-মা, আমি ক'দিন তেলুপুরায় গিয়ে থাকছি—বন্ধুর বাড়ি। মামারা চলে গেলে আমি আসব।

—তোর হাতের জল ফেলে দিলে—না? বলেই তিনি উঠে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ছেলেদের ঘরের দিকে। সেই অবসরে সে-ও বেরিয়ে চলে গিয়েছিল বন্ধুর বাড়ি। এসেছিল মামারা চলে গেলে। চলে গিয়েছিলেন তাঁরা হতাশ হয়ে। কারণ, দাদামশায় রেখে কিছুই যাননি। পেনসনের টাকা মৃত্যুতেই বন্ধ। ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউণ্ট ছিল—তার পাস বইয়ে ছিল মাত্র কয়েক টাকা কয়েক আনা। বাড়ি ভাড়ার। লাইফ ইনসিওরেন্সের একটা প্রাপ্য ছিল—হাজার তিনেক—কিন্তু সেটাকে বন্ধক রেখে কোম্পানী থেকে—যতখানি পেতে পারেন ধার নিয়ে তিনি তাকে শূন্যতে পরিণত করেছিলেন। সেই টাকাটাই ছিল দিদিমার হাতে। কিন্তু তার কোন কিনারা তাঁরা করতে পারেন নি। আর ছিল কিছু গহনা। সে দিদিমায়ের নিজস্ব।

দাদামশায়ের মৃত্যুর পর দিদিমা তাকে নিয়ে খুব সস্তার বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। এবং দিব্যেন্দু হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে—আই. এস্‌সি. পাস করে এঞ্জিনীয়ারিং পড়া শুরু করেছিল। মামাদের সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। এবং দিদিমার সঙ্গেও তাঁরা আর পত্র দিয়েও সম্পর্ক রাখেন নি।

দিব্যেন্দু বলত, সি ওয়াজ এ ভেরী হেভী লেডী—ভেরী হার্ড। যেমন শক্ত তেমনি ভারী! মানে একখানি স্টোন-রোলার। নড়ানো যেত না। বুঝেছ বিয়াস, একটা বিচিত্র ধর্মঘট ছেলের। তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত চালালে—কিন্তু তিনি হার মানলেন না।

দিব্যেন্দুর যখন এঞ্জিনীয়ারিং কোর্সের শেষ বছর, সেবার তিনি মারা গেলেন। তখন তাঁর হাতে মজুত সামান্যই। শ' আষ্টেক টাকা। দিব্যেন্দু তখন নিজেও উপার্জন করে; তার আলাপ ছিল বাংলা প্রেসের সঙ্গে, কিছু কিছু লেখার সূত্রে প্রুফ দেখে কিছু উপার্জন করত। একটা প্রাইভেট টিউশনিও করত। দিদিমার মুখাগ্নি সে-ই করেছিল এবং শ্রাদ্ধও করেছিল। মামাদের ঠিকানা জানত না। পুরানো ঠিকানায় পত্র দিয়েছিল কিন্তু কোন উত্তর বা কেউ আসেনি।

দিদিমার মৃত্যুর পর তাকে পাস করে বসে থাকতে হয় নি; চাকরি পেয়েছিল। নিজের পৈতৃক গ্রামের নাম জানত এই পর্যন্ত। আজও পর্যন্ত কেউ তার খোঁজ নেয়নি। তারও কখনও খোঁজ নেবার কথা মনে হয় নি এবং মনেও নেই। তারপর কাশী ছেড়ে চাকরি-জীবন।

এই সব কথা কতবার শুনেছে—কখনও আগাগোড়া, কখনও খানিকটা টুকরো, কিন্তু কখনও মনে হয়নি—যদি কখনও এই এমনি ঘটনার মধ্যে দিব্যেন্দুর খোঁজ করতে হয় তো করবে কোথায়? দিব্যেন্দু চলে যাওয়ার পর প্রথম কথাটা মনে যখন হয়েছিল সেদিন—তখনও এর উপর এতটা জোর দেয়নি। ভেবেছিল, দু-তিনদিনেই চিঠি পাবে তার! লিখবে, 'বিয়াস, হঠাৎ চলে আসতে হয়েছে—' কিন্তু আজ এক মাস হয়ে গেল, দিব্যেন্দুর কোন

সংবাদ নেই। কাল তার উপর খবর পেয়েছে, দিব্যেন্দু হেড আপিসে রেজিগনেশন লেটার দাখিল করেছে, এবং তা গৃহীতও হয়ে গিয়েছে। তার জায়গায় নতুন লোক নেওয়া হবে, তার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে কাগজে। স্তম্ভিত হয়ে গেল বিপাশা। তাকে কোন একটা কথা জানালেও না দিব্যেন্দু, তাকে জানানো প্রয়োজনই মনে করলে না!

কথাটা আজ বেশী করে মনে হচ্ছে, তার কারণ আজ খবর এসেছে, দিব্যেন্দু রেজিগনেশন দিয়েছে। রেজিগনেশন-এর অর্থ—এখানকার সঙ্গে সে সম্পর্ক শেষ করে দিয়ে নূতন জীবন-ক্ষেত্রে আহ্বান পেয়েছে। তার মধ্যে অনেক কিছু আছে—শুধু এখানকার কাজ-কর্ম যন্ত্রপাতি সংগঠন এগুলিই সে পিছনে রেখে চলল তা তো নয়, এখানে যারা কর্মী, এতদিনের কর্মসঙ্গী, যাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সঙ্গে তার সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না জড়িয়ে ছিল—তারাও পিছনে পড়ে রইল। সব থেকে বিচিত্র এবং বিস্ময়কর এই যে, এমন মিশুক, এমন আবেগ-প্রবণ সর্বজনপ্রিয় কারুকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালে না? তাকেও না? অথচ তার সঙ্গে তার জীবন যে অচ্ছেদ্য-বন্ধনে জড়িয়ে গেছে ভেবেছিল। এক মুহূর্তে যেন নল রাজার মত ছুরি দিয়ে বন্ধন কেটে তাকে বনের মধ্যে দময়ন্তীর মত ফেলে চলে গেল। তাহলে তার সব ভুল হয়ে গেছে?

এ তাহলে দিব্যেন্দু কি সেই মানুষ, যে স্বল্পকাল পরে অকস্মাৎ দেখা হলে আগেভাগে সোল্লাসে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কাউকে ভ্রূক্ষেপ না-করে বহু লোকের সামনে হাত তুলে চিৎকার করে উঠবে—হে—! হ্যালো হ্যালো—হ্যালো—!

অনেক দিন পর হলে হয়তো মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলবে—ওয়েল স্যার, ডোণ্ট টেক্ অফেন্স প্লিজ—অথবা—প্লিজ এক্সকিউজ মি ইফ আই অ্যাম রং। হে ঈশ্বর—হে ভগবান! দিব্যেন্দু কি তাকেও এই সাধারণ বন্ধু-বান্ধবদের সামিল করলে! ঈশ্বর ভগবান—এ দুটি শব্দ ছাড়া আর কোন্ শব্দ তার মুখ থেকে বের হতে পারে এক্ষেত্রে!

শয়তান? না। এ শব্দ নাস্তিকেও উচ্চারণ করবে না। বিপাশা তো তা পারবেই না। জীবনে সান্ত্বনার জন্য শয়তানকে ডাকতে তো পারবে না।

* * *

সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে। ড্যামের রাস্তার উপর দিয়ে চলেছে সাঁওতালদের ছেলেমেয়ে। কখনও কখনও চলছে সাইকেল-আরোহী নতুন ভারতের নবীন নাগরিক। পূর্ব পাড়ের পাহাড়ের মাথায় সূর্যের লালচে আলো পড়েছে। সামনের দিকে রিজারভয়র লেকটা লাল জলে ভরে আছে; মাঝখানে দ্বীপটা জেগে রয়েছে, ওদিকে পাহাড়, এদিকেও পাহাড়—কিন্তু তার উপর দিয়ে চলে গেছে পিচ-ঢালা রাস্তা মাইথন হয়ে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড পর্যন্ত। তাকে দেখে তার মনের অবস্থা অনুমান করা যায় না। বাইরে থেকে শান্ত এই লেকটার মত। কোন স্রোত নেই মনে হচ্ছে। যেন নিথর জলরাশি পড়ে রয়েছে, মধ্যে মধ্যে বাতাসে ঈষৎ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে, এই পর্যন্ত। কিন্তু বরাকরের জল আসছে উপর থেকে—লেকের মাথায় জমছে—নীচের দিকে ছুটবার জন্য সে ঠেলা মারছে এই বিরাট বাঁধটার উপর। বোধহয় এক হাজার হাতী একসঙ্গে মাথা দিয়ে ঠেললে যে চাপ হয়—তার থেকেও অনেক

বেশী। ওই যেখানে হাইড্রলিক যন্ত্রগুলি বসানো আছে, সেখানে গেলে বুঝতে পারা যাবে। এই জলের মাত্র একটা অংশ সেখানে নির্গমন-পথে বের হচ্ছে—তারই ঠেলায় চলেছে ওই যন্ত্রগুলি। বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরী হচ্ছে। ওপাশে বরাকরের খাতে কলস্বর তুলে তরঙ্গভঙ্গে ছুটছে সে জল। কিন্তু এ পাশের লেকটা বাইরে থেকে দেখতে স্থির শান্ত একখানা বিস্তীর্ণ গেরুয়া রঙের সতরঞ্জির মত যেন এই নির্জন পার্বত্য বনভূমের তলদেশে কে বিছিয়ে রেখেছে, একটা যেন আসর পাতা হয়েছে।

বিপাশা না-হয়ে অন্য মেয়ে হলে সে বোধহয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত কোন নির্জন স্থানে, হয়তো বা গলায় দড়ি দেবার বা বিষ খাবার কল্পনা করত। অবশ্য এমন মেয়েও আছে, যারা নীচে নেমে গিয়ে লেকের জলে মুখহাত ধুয়ে, দিব্যেন্দুর সকল স্পর্শচিহ্ন ও স্পর্শস্বাদ মুছে ফেলত। এর অনেক আগেই মুছে ফেলত। দিব্যেন্দু চলে গেছে এক মাস। তারা হয়তো এক সপ্তাহ অপেক্ষা করত। বেশী হলে পনের দিন। এবং আজ এক মাস পর যখন তার রেজিগনেশনের সংবাদটা এল, তখন একটু বক্রহাসি হেসে ঠোঁট দু'টি একবার উল্টে নিয়ে, দিব্যেন্দুর পরেই যে ব্যক্তিটি তার মানসলোকের দুয়ারের কিউয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার সন্ধানে চারিদিকে চেয়ে দেখত। তার উল্টো প্রকৃতির হলে? নীচের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে বিপাশা—প্রায় একশো ফুট নীচে জল। নীচে আরও হয়তো এতটাই থাকবে। সে শুনেছে কলকাতার বড় বড় বাড়ি কয়েকটাই থাক করে সাজালে জলের তলে ডুবে যায়। এখান থেকে একশো চার পাউণ্ড ওজনের চার ফুট আট ইঞ্চি লম্বা একটি মেয়ে লাফ দিয়ে পড়লে তলা পর্যন্ত যেতে যেতেই শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বিপাশা জীবনচক্রে পাক খেয়েছে মহাকালের তাণ্ডব নৃত্যের ছন্দে এবং গতিতে। পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে জীবনের হাপরে সর্বনাশের আগুন জ্বলে। সেই আগুন যখন জ্বলে, তখন কত মানুষ যে গলে-পুড়ে ছাই হয়ে শেষ হয়ে যায়, তার আর ঠিকঠিকানা থাকে না। কিন্তু যারা তাতে পুড়েও কালের হাতুড়ির পিটনে একটা গড়ন নিয়ে বেরিয়ে আসে, তারা ওই দুটোর কোন দলেই পড়ে না। বোধহয় মৃত্যুর চিতায় পোড়ালে তাদের সব হাড়গুলো পুড়বে না, এবং মাটির সঙ্গে মিশে থেকেও হাজার বছরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাবে না, হয়তো পাথরে পরিণত হবে। এই বাইশ বছর বয়সে সে কালান্তরের আগুনের হাপরে পড়েও ছাই হয়নি।

এই দুটো দল ছাড়াও আর দুটো দল আছে। একটা বন্য বর্বর—সেই বনের সভ্যতার মেয়ে, যে এরপর ছুরি হাতে খুঁজে বেড়াবে দিব্যেন্দুকে পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত। তার বিপরীত প্রান্তে, আর একদল—যারা এর পর সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে বেদনার বৈরাগ্যে। সে মরবেও না, সন্ন্যাসিনীও হবে না। এই বাইশ বছরের জীবনের মধ্যেই ওই মহাকালের অগ্নিকুণ্ড হেঁটে পার হবার সময় এক বুড়ো সর্দারজীর একটা কথা শুনেছিল—কথাটা তার জীবনে গাঁথা হয়ে আছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাঞ্জাবে চলে আসছে তখন, সেই আসবার সময় একজন জীপে-চড়া অফিসার, সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করেছিল—তার কে কোথায় আছে তার কথা। সর্দার বলেছিল, কেউ কোথাও নেই, সব খতম হয়ে গিয়েছে। জরু বেটা বহু দো পোতা—বিলকুল খতম। আছি আমি একা। আর এই পথে

কুড়ানো লেড়কী।

ভুরু কুঁচকে কপাল কুঁচকে সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসেও অফিসার বলেছিল—সর্দারকে বলে নি, বলেছিল তারই সহকর্মীকে—দেখ, এই বাঁচার কিছু মানে হয়? বাংলাতে বলেছিল। তারা দুজনেই ছিল বাঙালী। সর্দারজী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছিল—বাবুজী, হামি বাংলা সমঝে। ওর জবাব আমিও জানতাম না এর আগে; এই বুড়ো বয়সে ভীষণ খুনোখুনির মধ্যেই জানতে পারলাম। উমর হয়ে গেল সোত্তর। সে উত্তর শুনবে? বাবুজী, মানুষ যতক্ষণ মরণের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে লড়াই না করে, ততক্ষণ জীবনের মানে সে বুঝতে পারে না। বাঁচার মানেও না। মরণের সঙ্গে লড়ে মর—তাতেও বুঝতে পারবে—বাঁচো, তাতেও বুঝতে পারবে। তাই বাবুজী, মরণ আজকাল যেমন সামনা-সামনি দাঁড়িয়েছে তেমন করে যতক্ষণ দাঁড়ায় না—আর তাই তো বলতে গেলে বেশীর ভাগ কাল দুনিয়ার জিন্দিগীতে—খায় দায়, কাম করে, নিদ যায়, আর রোগ হলে মরে—তখনই মানুষ জীবনের মানে খুঁজতে সন্ন্যাসী হয়, তপস্যা করে, কিতাব লেখে, গীত রচনা করে, আর কাঁদে; বলে—এর মানে খুঁজে পেলাম না বলে—কি হবে বেঁচে, আত্মহত্যাও করে। দেখ বাবুজী, শেষ ছিলাম আমি আর আমার এক বেটা, পচাশ বছরের জোয়ান। আসছিলাম—পথে মিলল এই লেড়কী। বারো বছরের খুবসুরত লেড়কী পথের ধারে পড়ে ছিল, ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছিল। তুলে নিলাম বাবুজী। নিয়ে যাবে ওরা লুটে। বিক্রি করে দেবে হাটে, বাঁদী বানাবে। নিয়ে আসছিলাম। শেষে লড়াই হল, বাবুজী, হিন্দুস্তানের সীমানায় আধা মিল আগে। রাতে আমাদের দলের উপর ওরা বহুত ভারী দলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আঁধিয়ারা—তার উপর দলে ভারী ওরা। আমরা ছিটকে পড়লাম ইধার উধার। একটা গাঁওয়ের একখানা ভাঙা বাড়িতে বাপ বেটা আর এক লেড়কী—তিনো প্রাণী ঢুকে পড়েছিলাম। ওরা জানতে পারে নি। তারপর তখনও রাত শেষ হয়নি, নেকড়েরা যেমন গন্ধ পেয়ে সন্ধান পায়, তেমনি ভাবে কেমন করে ওরা চার আদমী এসে দাঁড়াল বাইরে, আর হুকুম করলে—বাইরে আয়রে কুত্তা-লোক। বেটা আমার ঘুমিয়ে ছিল, ওকে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দিলাম। ঐ লেড়কী কেঁদে উঠল। বাইরে তারা হল্লা তুললে, ছোকরী আছে। আমরা কিরপান নিয়ে বললাম—বাইরে আমরা যাব না, মেহমান এস তোমরা, ভিতরে এস। তোমরা চার, আমরা দুই। আমরা দুজন যাব, কিন্তু তোমাদের দুজনকে নিয়ে যাব। তোমরা দুজন ফিরবে। লোকসান কি—এস! তারা বললে—না রে কমবক্ত, আমরা পাঁচজন যাব। আমরা চারজন, আর ওই ছোকরী! বললাম—বহুৎ আচ্ছা, এস তাহলে! বাবুজী, ঘরের মধ্যে থেকে আমাদের সুবিস্তা ছিল, লড়াই দিলাম। ওরা একজন গেল, আমার বেটা নিলে তাকে। কিন্তু একটা বর্শা বিঁধে দিলে বেটার বুকে আর একজন। তখন মনে হল একবার, বাবুজী, বেঁচে কি হবে? কিন্তু মনে পড়ল এই লেড়কীর কথা। হামি লড়াইমে তিনজনের জান নিলাম। বেটা একটা কাম করেছিল—ওদের একটাই বর্শা ছিল, সেটা কলিজায় নিয়ে শুয়ে ছিল, আর তার ভারে সেটা ভেঙেও গিয়েছিল। তিনজনকে নিতে আমাকে বেগ পেতে হয় নি। তিনজনের একজন খতম, একজন বহুত জখম—বাঁচবে না, আর একজন বাঁচতেও পারে।

আমি আর দাঁড়াই নি বাবুজী, মরা বেটা পড়ে রইল—গুরুজীকে বললাম—তুমি গতি করো, অলখ নিরঞ্জনকে বললাম—তোমার হুকুমেই মরা বেটাকে ফেলে, এই লেড়কীকে নিয়ে আমি চললাম। সেই শেষ রাতে, লেড়কীকে নিয়ে, কখনও কান্ধায় কখনও হাঁটিয়ে, টেনে হিঁচড়ে ভোর-ভোর এই এলাকায় এসে ঢুকলাম। এই বাঁচায় জীবনের মানে বুঝেছি, দাম বুঝেছি। আউর ভি দশ-বিশ বরষ বাঁচতে চাই। তুনিয়া ন-তিতা বাবু ন-মিঠা। তোমারই জিভেই আছে তিতা আর মিঠার তার। তুমি বিশ্বাস করতেই পারবে না বাবুজী, যখন লেড়কাকে কান্ধা পর নিয়ে হিন্দোস্তানের জমীনের পর এসে পড়লাম, তখন সাক্ষাৎ অলখ নিরঞ্জনের পরশ পেয়ে গেলাম, তাঁর জ্যোতি দেখলাম, তাঁর বাত শুনলাম, বললেন—জিতা রহো! বল তো বাবুজী—মরতেই যদি চাইব, মরাই যদি আমার উচিত, তবে তুনিয়ায় এতকাল ধরে সাধু মহন্ত গুরু পিতা-মাতা কেন, 'জিতা রহো' বলে আশীর্বাদ করে? অলখ নিরঞ্জনই বা বললেন কেন, জিতা রহো? জীবনের ধর্মই হল বাঁচা, জিন্দগী বাবুজী; মরা নয়। লড়াইয়ে মরা—সে বাঁচাই বাবুজী—মরা নয়।

বাবুরা হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন, বরং অপ্রতিভ অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। বলেছিলেন—না—না সর্দারজী, আমরা ঠিক তা বলি নি। মানে আমরা—অপর জনে, প্রথম কথাটা তিনিই বলেছিলেন, তিনি এবার ইংরাজীতে বলেছিলেন, কাজ কি কথা বাড়িয়ে, থেমে যাও। বিচিত্র তুনিয়া—শুধু দেখে যাও। বুদ্ধের এখন দর্শনের আশ্রয় ছাড়া আশ্রয় কোথায়! থেমে যাও।

সর্দারজীও এবার বলেছিল—হাঁ মহাশয়, থেমে যাওয়াই ভাল। আমিও কিছু কিছু ইংরাজী জানি। এককালে পেশাতে ছিলাম মাস্টার। আপনাদের ক্যালকাটায় আমি গুরুদোয়ারা পরিচালিত ইস্কুলে মাস্টারি করতাম। হিন্দীও জানি। উর্দু তো জানিই। কাজেই থেমে যাওয়াই ভাল। কাজ কি?

তাঁরা এর পর কাজে মন দিয়েছিলেন। তাদের একজন, সরকারী অফিসার—অবস্থা দেখে বেড়াচ্ছিলেন, গায়ে মিলিটারি উর্দি; আজ বিপাশা বলতে পারে তিনি ছিলেন আই. এম. এস.। রেফুজীর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করে বেড়াচ্ছিলেন—আর সঙ্গের লোকটি ছিল খবরের কাগজের লোক—বাঙালী। ওই কাগজের লোকই প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল।

সর্দারজীর বিবরণ শুনেছিল আগে। কলকাতায় মাস্টারী করত দশবছর আগে, ষাট বছরে দেশে গিয়ে ক্ষেতের কাজে মন দিয়েছিল। গাঁয়ে থাকত স্বামী আর স্ত্রী। এক বেটা, বেটার বউ, দুই ছেলে থাকত শিয়ালকোটে। ওখানে ব্যবসা করত—ঘোড়ার সাজের ব্যবসা। বৃদ্ধের বাড়ি ছিল কিছু দূরে ওই এলাকাতেই। হিন্দুস্থানে আজাদী এল, দাঙ্গা শুরু হল বাংলায়। তারপর পাঞ্জাবে। যে গাঁয়ে বুড়ো থাকত, সে গাঁয়ে শিখ বেশী হলেও এলাকায় মুসলমান বেশী। গাঁওয়ে যখন হামলা হল, তখন দুদিন লড়ার পর তারা গাঁও ছেড়ে দল বেঁধে বের হল, চলবে জম্মু হয়ে হিন্দুস্থানের দিকে। বুড়ী চলতে পারছিল না। বৃদ্ধ বললেন—বাবুজী, একরোজ রাতে বুড়ী নিজের জান নিজে বরবাদ করে দিলে—একটা নদীর পুল থেকে

হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, তার আগে থেকেই বলছিল—আমি ভার হয়েছি, তুমি চলে যাও—শিয়ালকোটে জলদি যাও, সেখানে বাচ্চাদের হাল কি হল দেখো। আমি মরে যাই। আমি অনেক বুঝিয়েছিলাম, তারা তিন বাপ বেটা আছে—তিন জোয়ান আর এক জেনানী, তাদের জন্য তুমি ভেবো না। কিন্তু না ভেবে উপায় ছিল না; কারণ খবর পাচ্ছিলাম শিয়ালকোটে হিন্দু ঔর শিখ ঔরতের বেইজ্জতির আর কিনারা নেই। ওরা বলছে অমৃতসরে মুসলমান ঔরতের বেইজ্জতির কিনারা নেই। তার বদলা ওরা শিয়ালকোটে ঔরতদের রাস্তে পর নংগী খড়ী কর দিয়া। ওউর—। শেখপুরামে ইজ্জতকে লিয়ে শিখ ওউর হিন্দু লোক—বেটি-বহু-জরুদের খুন ক'রে বেইজ্জতি থেকে বাঁচিয়েছে। ভাবনা আমারও হচ্ছিল। আসছিলাম আমরা পাঁচশো আদমী। শুধু বুড়ারাই নয়—দশ বিশ ঔরৎ আপনি আপনার জান মেয়ে দিয়েছিল। পথে তো হামলার শেষ ছিল না। ওরা মধ্যে মধ্যে পথে আটকাচ্ছিল, লড়াই হচ্ছিল। কিছু ছিনিয়েও নিয়ে যাচ্ছিল। বুড়া মরল। আমি শিয়ালকোটে যখন এলাম, তখন ওদিকে ওরা তিন বাপ-বেটা মওজুদ। বেটার চোখ লাল। এক পোতা ছোরা খেয়ে জখম হয়েছে। শিখ হিন্দুর দল বেরুস বেরুস করছে। বহুকে বেটা নিজের হাতে কেটেছে। ওখান থেকে বের হলাম। পথে একদিন পরে গেল জখম হওয়া পোতা। তিন দিন পর আর এক পোতার হল কলেরা। দুদিনে সেও গেল। তখন বাবুজী, আমরা জম্মুর এলাকা থেকে দূরে নেই; ওরা শেষ হামলা করলে। আমরা বাপবেটায় পোতার লাশ নিয়ে সৎকার করবার জন্যে রয়ে গেলাম। কাঁধে নিয়ে গেলাম দরিয়ার সন্ধানে—ভাসিয়ে দেব। সিরিফ দুজন হয়ে গেলাম। লাশ ভাসিয়ে দিয়ে রওনা হয়ে আসছি, পথের ধারে দেখলাম লেড়কী পড়ে আছে। একটা খাদের ভিতর পড়ে আছে, মনে হল উপর থেকে পড়ে গেছে। আমরা ওদের হল্লা শুনে এই খাদটার মধ্যে লুকোতে চেষ্টা করেছিলাম। দেখলাম, লেড়কী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। পড়ে বেহোঁস হয়ে গিয়েছিল—হোঁস হয়েছে। পরনের পোশাক দেখে মনে হল হিন্দু বা শিখ, রঙ দেখে মনে হল হয়তো এর মা-বাপ ইওরোপীয়ান—অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—বোধহয় ক্রীশ্চান। নাম পুছলাম—বললে বিপাশা। জাত পুছলাম, বললে হিন্দু। বাস্, আর কিছু পুছলাম না, সন্ধ্যা হতেই খাদ থেকে বের হলাম, ও তাকিয়েই ছিল আমাদের দিকে—পড়ে গিয়ে জখম হয়েছিল—পড়েছিল বোধহয় গাছের বা ঝোপের উপর নইলে বাঁচতই না। কি করব? আমি ওকে কান্ধা পর তুলে নিয়ে বললাম—চলো। বেটা এগিয়ে এসে বললে—আমাকে দাও পিতাজী, আমি জোয়ান তুমি বুড়ো। তারপর তো বলেছি বাবুজী। পরমাতমার হুকুমে সব যাওয়ার পরও বেঁচেছি—আর ওই লেড়কীকে বাঁচিয়েছি, বাস্, তার জন্যে মনে কুছ আপসোস আমার নেই।

তারপর সাংবাদিক—আজ বিপাশা ওকে সাংবাদিক বলছে—কিন্তু সে-দিন সে লোকটি তার কাছে আখরকো আদমী কিংবা জার্নালিস্ট ছিল; সাংবাদিক তাকে কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করেছিল। উর্দুতেই করেছিল—

কি নাম তোমার? সর্দারজী বলেছিল—বিপাশা। চমৎকার নাম।

উত্তর সে দেয়নি। দিয়েছিল সর্দারজী। অফিসার মশায় চুরুট টানছিলেন এবং শুনছিলেন।

সর্দারজী বলেছিলেন—নাম বহুত সুন্দর আর ওই নাম ভি ওর খাঁটি সত্য। বিপাশা হল পাঞ্জাবের পঞ্চ দরিয়ার এক দরিয়া। মিয়ানি শহরের কোল ঘেঁষে এসে শতদ্রুর সঙ্গে মিশে সিন্ধুতে পড়েছে। কিন্তু বাবুজী, ওর মহিমা হল বৃহৎ মহিমা। রামায়ণের ঋষি বশিষ্ঠের একশো বেটা, ওই বেটাদের নাশ করেছিল ওঁরই শিষ্য। ওঁরই শাপে সে হয়েছিল ব্রহ্ম রাকসস। এতবড় ঋষি পুত্রশোকে অধীর হয়ে নিজের হাতে-পায়ে পাশ দিয়ে বন্ধন ক'রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন বিপাশার জলে। বিপাশা দরিয়া ঠিক এই লেড়কীর মত—"ঋষির পাশ-বন্ধন খুলে" তীরে তুলে দিয়ে বলেছিল—"বাঁচ ঋষি; শোককে জয় করে বাঁচ। লড়াইয়ে মর হুসরি বাত, কিন্তু লড়াইয়ে হেরে নিজেকে নিজে খতম করা সরম কি বাত। ও পাপ।" এ লেড়কী সত্যই বিপাশা।

অফিসার বলেছিলেন—সর্দারজী, আপনি থোড়া বিশ্রাম করুন। ওকে কথা বলতে দিন। তারপর বিপাশাকে বলেছিলেন—এখন তুমি বল বিপাশা।

বিপাশা ঠিক ধরতে পারে নি। সে অন্যমনস্ক ছিল। বিহ্বল অবস্থায় তখনো সে আচ্ছন্ন। অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল। সাংবাদিক ডেকেছিলেন তুড়ি দিয়ে—তুড়ির শব্দে তাকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন।

এই—এই—শুনো।

বুকে হাত দিয়ে সে বলেছিল—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ। তোমার নাম তো বিপাশা?

—হ্যাঁ।

—তবে সাড়া দাও না কেন?

—বিপাশা বলে তো ডাকে না আমাকে—আমাকে ডাকে বিয়াস বলে।

—আচ্ছা।

—তোমার ঘর কোথায় ছিল?

—শিয়ালকোট।

—কোন্ জাত?

—হিন্দু।

—বাবার নাম কি ছিল?

—নগিন্দর নাথ ভট্টচারিয়া।

—ভট্টচারিয়া?

—হ্যাঁ।

—তুম লোক বাঙালী?

—হ্যাঁ। বাবা বলতেন আমরা বাঙালী। এবার সে তার জানা বাংলায় উত্তর দিয়েছিল।

—বাংলা দেশে কোথায় বাড়ি?

—তা জানি না। কলকাত্তার নজদিক এই জানি!

-- কতদিন আছ শিয়ালকোটে? পাঞ্জাবে তোমাদের কতদিন বাস?

—বহুত দিন। হামার দাদো এসেছিল পাঞ্জাব, বাবা বলতেন। হামি বাংলা মুলুক দেখি নি। হামার জনম হয়েছিল বিয়াস দরিয়ার ধারে এক গাঁওয়ে। ওই লিয়ে মেরি নাম বিপাশা। —ডাকে বিয়াস নামসে।

—কি করতেন বাবা?

--পিতাজী প্রফেসর ছিলেন।

- তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল কি করে? তিনি কোথায়?

—ওই খাদের ধারে আমাদের দলের উপর হামলা হয়েছিল—লড়াই হয়েছিল। ইদিক-উদিকে হঠবার সময় আমি গির গিয়েছিলাম। পিতাজীর বুকে গুলি তার আগে লেগে তিনি গির্ গিয়েছিলেন। কেঁদে ফেলেছিল বিপাশা। সর্দারজী তার মাথায় হাত রেখে বসে ছিল।

কিছুক্ষণ পর সাংবাদিক আবার প্রশ্ন করেছিলেন—

—মাতাজী?

—মাতাজী দু বরিষ আগে মারা গিয়েছেন!

- আর কে আছে?

সে তাকিয়েছিল সর্দারজীর দিকে।

সর্দারজী বলেছিলেন --উপর দেখলাও বেটী। এক হ্যায় উপরমে—আওর হ্যায় তুমারা কলিজামে।

—সে আছে আর তুমি আছ। আমি ফালতু। ভরোসা ভগবানের, পরমাত্মার; আর জিন্দিগীর হিম্মৎ তোমার। ব্যাস।

আজ মনে হয়—সেদিনের সেই দিন আর সর্বহারা রক্তাক্ত পরিচ্ছদ বৃদ্ধ সর্দার বলেই এত কথা তার মানিয়েছিল—এবং অফিসাররাও শুনেছিল--নইলে মানাতও না, কেউ শুনতও না—হয়তো বৃদ্ধ সর্দার বলতও না। বারো বছরের মেয়ে বিপাশার সে অবস্থা ছিল কেমন স্তম্ভিত হয়ে-যাওয়া অবস্থা। স্তম্ভিত হয়ে সে শুধু শুনেই গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য। আজও পর্যন্ত শিয়ালকোট থেকে শুরু করে সেই 'নিবিড় তিমির নিশীথিনীর' মত সেই ক দিনের কথা তার মনে আজও একেবারে স্পষ্ট হয়ে আছে। সব কথার অর্থ সেদিন বোঝেনি—পরে ধীরে ধীরে মনে পড়ছে—মনে করেছে আর বুঝেছে।

অফিসার সর্দারের কথায় বলেছিলেন—হ্যাঁ, আপনি সচ বাত বলেছেন। একটু থেমে থেকে আবার প্রশ্ন করেছিলেন—বোধ করি এইটেই তাঁর আসল কথা—এই কথাতে আসবার জন্যেই আগেরটুকু ছিল সান্ত্বনা দেওয়া, বলেছিলেন—এখন আপনার কি সাহায্য করব বলুন? এখানে সরকারী আশ্রয়-ক্যাম্প হয়েছে, চলুন সেখানে। তারপর তাঁরাই ব্যবস্থা করবেন আপনি যেখানে যাবেন সেখানে পাঠাবার।

সর্দার বলেছিলেন—আমি কোথাও ঠাহরতে চাই না সাহেব। আমি অমৃতসর গুরুদোয়ারায় যাব—অমৃতকুণ্ডে আস্নান করব। এই সব খুন ধুয়ে ফেলব। আজই আমি

রওনা হতে চাই।

—এই বাচ্চা লেড়কী—এ যেতে পারবে?

একটু থেমে সর্দারজী বলেছিলেন—ওর দায় কি এখনও আমাকে বইতে বলছেন আপনারা? দেশে আজাদী এসেছে—সরকার এখন হামারই সরকার—; আজাদীর বাটোয়ারার লড়াইয়ে লেড়কা ওর বাপ হারিয়েছে। ও তো সরকারের লেড়কী, ভার তো তাদের।

অফিসার বলেছিলেন—ঠিক হ্যায়। সরকার ভার নিশ্চয় নেবে—শুধু ওর কেন আপনাকেও তো বলছি—

—হামারা সব কুছ গয়া—সরকার হামারা জিন্দাবাদ—লোকেন এখন ভরোসা আমার পরমাত্মার। আমার আত্মা বলছে গুরুদোয়ারায় গেলে তাঁর সন্ধান আমার মিলবে। ওর ভার তোমরা নাও সাহেব। এ লেড়কী বলেছে ওরা বাঙালী—তোমরা বাঙালী—

অফিসার বলেছিলেন—আমি তো সরকারী কামে ঘুরছি সর্দারজী। আর ইনি বাংলার আখবরের লোক। আমি আপনার আর লেড়কীর অমৃতসর যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সেখানে পৌঁছে দিয়ে চলে যাবেন। লেড়কীকে দেখে মেমসাহেবের লেড়কী বলে মনে হয়—একে একলা রাস্তায় যেতে দিলে বিপদ হতে পারে।

—বহুত আচ্ছা। পরমাত্মার যখন তাই ইচ্ছা—তখন তাই হবে। ওর ভার আমি বইব অমৃতসর পর্যন্ত।

লরীতে এসেছিল ওরা অমৃতসর। গায়ে তখন জ্বর, অসহ্য বেদনা। কলেরা ইনোকুলেশন দিয়েছিল লরীতে সওয়ারী হবার আগে।

সর্দারজী তাকে কোলের কাছে নিয়ে বসেছিলেন, ফণাধর অজগর সাপের সন্তান-স্নেহ আছে কি না তা বিপাশা জানে না, কিন্তু শুনেছে, মা-সাপ ডিমের উপর আহার-নিদ্রা ছেড়ে বসে থাকে, আশে-পাশে সামান্য শব্দে গর্জন করে। সর্দারজীও ঠিক তাই ছিলেন। তাকে কোন কথা বলেন নি; শুধু পিঠে হাত রেখে এসেছিলেন সারাটা পথ। এবং কেউ তাকে একটু ঠেললে কি তার সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইলে, গর্জন করে উঠেছেন। শীত পড়ছে তখন; পাঞ্জাবের শীত; লরীতে ওঠার আগে ফি জনকে দুখানা করে কম্বল দেওয়া হয়েছিল; সর্দারজী নিজে একখানা কম্বল রেখে তার গায়ে তিনখানা কম্বল জড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কথা বলেন নি—তার বাপ, মা, অতীতের কথা, এমন কি কষ্ট হচ্ছে কিনা তাও প্রশ্ন করেন নি। নিজে যতটুকু অনুভব করেছেন, তারই সাধ্যমত প্রতিকার করেছেন। বোধহয়, তাঁর অন্তরের অন্তর পরমাত্মার সন্ধান করছিল। তার সঙ্গে কারবার ছিল বাইরের অন্তরের। কিংবা কথাবার্তা বলে তার মধ্যে দিয়ে নিজের অন্তরস্রোতের সঙ্গে তার অন্তরস্রোতের সংগম ঘটাতে চাননি। স্রোতের মত যার সত্তা তার দুটি মিশে একটি হলে আর তাকে আপন আপন সত্তায় পৃথক করা যায় না। সেই মিলিত স্রোত আবার যখন পৃথক হয়, তখন দুয়েরই কিছু কিছু ছিন্নভিন্ন পৃথক হয়ে যায়। সেই বিচ্ছেদ মর্মচ্ছেদী। বোধকরি, তার ছিন্নভিন্ন মর্মকে আরও বেশী করে রক্তাক্ত করতে চাননি।

অমৃতসরে তাকে রিহ্যাবিলিটেশন আপিসে দেওয়ারই কথা। অফিসারটি একখানি পত্র দিয়েছিলেন এয়ারফোর্সের এক বাঙালী অফিসারের নামে। সর্দারজী খোঁজ করে অনেক চেষ্টা করে সেই অফিসারের সঙ্গে দেখা করে তার হাতে চিঠি দিয়ে তার জিম্মায় তাকে দিয়ে এসেছিলেন।

অফিসার চিঠি পড়ছিলেন, সর্দার তাকে এতক্ষণে বলেছিলেন-- লেড়কী, এখন আমার ছুট্টী। এইবার আমি চলে যাব। তোমার ভালমন্দ এখন তোমার নসীবের হাতে। আর নসীবের মন্দ খেলের হাত থেকে বাঁচবার ভার পরমাত্মার হাতে আর তোমার আত্মার হাতে। ভরোসা পরমাত্মার—হিম্মৎ তোমার আত্মার। পরমাত্মা বাৎলাবেন কি করতে হবে—তোমাকে তাই করতে হবে। আনন্দ রহো বেটী। ইয়াদ রাখো কি, জীবনকে আনন্দ হ্যায় জিন্দিগীমে। জানকে ধরম হ্যায় জিন্দিগী! বাঁচবে। লড়াই করে বাঁচবে। তবে হ্যাঁ—মরণও কভি কভি সাচ্চা হয়—সে কখন জান, যখন মনে হয় মরণেই আনন্দ। শোকে নয়, দুঃখে নয়, জানের ভয়ে নয়। আনন্দে। ইজ্জৎ বাঁচানোর আনন্দে। লড়াইয়ের আনন্দে।

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে এয়ার অফিসার বলেছিলেন--এই মেয়ে বাঙালী? দেখে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বা কাশ্মিরী মনে হচ্ছে! ইংরিজীতে বলেছিলেন।

বিপাশা ভাঙা বাংলায় বলেছিল—হামার পিতাজীর নাম হচ্ছে নগিন্দরনাথ ভটাচারিয়া।

—নগিন্দরনাথ? নগেন্দ্রনাথ? হুঁ!

—হাঁ—নগেন্দ্রনাথ ভটাচারিয়া। কলকাত্তার নজদিকে হামাদের ঘর ছিল।

—আচ্ছা। তুমি বস!

সর্দারজী বলেছিলেন—নমস্তে সাব, হামি চলি! লেড়কীর ভার আপনার। আচ্ছা বেটী। আবার ঘুরে বলেছিলেন--হামার নাম হরদয়াল সিং, গুরুদোয়ারা অমৃতসর হামারা পতা। আচ্ছা।

সর্দার হরদয়াল সিং। তাকে অনেকবার চিঠি লিখেছে সে—দুএকখানা প্রাপকের সন্ধান মেলেনি বলে ফিরে এসেছে—বাকীগুলো ফেরতও আসেনি, উত্তরও মেলেনি।

দিব্যেন্দুও কি সর্দার হরদয়াল সিংয়ের মত হারিয়ে যাবে? সর্দার হরদয়াল সিং তার দ্বিতীয় পিতা--দিব্যেন্দু তার প্রথম প্রণয়ী। মনে মনে সে তো তাকে স্বামীত্বেই বরণ করেছিল। পরস্পরের কাছে মনের কথাটি অজ্ঞাত ছিল না। বলা হয় নি কোন দিন পরস্পর বাক্যবদ্ধ হয়নি —কিন্তু যা হয়েছে সে যে বাক্যে প্রকাশের চেয়ে অনেক বেশী।

বাক্যে প্রকাশ হয়নি--সেও তো দিব্যেন্দুর আগ্রহে। কতদিন সে বলেছে না ওইটুকু বাকী থাক, অনুক্ত থাক। পূর্বরাগের মাধুরীর মধু দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ সুলভ হয়ে গেলে শ্রমের পর বাতাস ও জলের স্বাদের দুর্লভতা হারিয়ে যাবে। চিনি খেলেও তেষ্টা যায় বিয়াস, কিন্তু বৈশাখের রৌদ্রে বালির প্রান্তর পার হয়ে ঝরনাকে আবিষ্কার করে জল খেয়ে যে তৃপ্তি, তার যে স্বাদ, তা কি চিনি-মিষ্টি খেয়ে জল খেয়ে পাওয়া যায়? তা হোক না সে সুন্দরী বধূর হাতের তৈরি।

প্রচণ্ড জীবনাবেগ-ভরা দিব্যেন্দু !

সর্দারজীর কথা শুনে বলত—ভারী ভাল কথা বিয়াস। জানকে ধরম্ হ্যায় জিন্দগী। জীবনকে আনন্দ হ্যায় জিন্দগীমে। জিন্দগী হ্যায় সাচ্চা। আওর বিলকুল ঝুট্টা। বহুৎ আচ্ছা। ঠিক কথা বিয়াস নইলে দুনিয়ায় আদি কাল থেকে সবাই ওই আশীর্বাদই করেন কেন—জিতা রহো। আনন্দ রহো।

দুর্দান্ত দিব্যেন্দু। প্রচণ্ড দুর্দান্তপনার জোরে তার জীবনটাকে যেন জবরদস্তি দখল করে নিয়েছিল। প্রথম পরিচয়েই সে যে কথাগুলো তাকে বলেছিল—অভিসম্পাত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেছিল, সেগুলো আজো তার কানে যেন সঙ্গীতের কথার মত মোহ এবং মাধুরীর সৃষ্টি করে। সেদিন তার ভাল লাগে নি। প্রচণ্ড ক্রোধ হয়েছিল।

দিব্যেন্দু প্রশ্ন করেছিল—তুমি বাঙালীর মেয়ে ? প্রশ্ন করেছিল অবশ্য তার এই রঙ চোখ চুল দেখে !

সে বলেছিল—হ্যাঁ। বাঙালী মানে কালো সাঁওতাল নয়। সে কি রঙে, কি আচারে-ব্যবহারে !

দিব্যেন্দু দমে নি ! বলেছিল—ওগো বর্ণগরবিনী, এত গরব ভাল নয়। এদেশ এই ভারতবর্ষের সব সৌন্দর্য কালোতে। তার সব সাধন কালোর জন্যে। সাদা শিব, কালীর প্রেমে পায়ে পড়েছেন। রাধারা কালোর জন্যে দেহপাত করেছেন। এদেশের সব থেকে বড় মানুষ, ভগবান বলে যাদের ডাকি, তারা হলেন—রাম আর শ্যাম। পাঞ্জাবে কাশ্মীরে তোমার মত অনেক রূপ দেখেছি, সেখানে আর্য সৌন্দর্য এসে কালো চুল কালো চোখ নিয়ে অপরূপ হয়েছে। মার্জারসুন্দরী, তোমাকেও আমি বলছি, কালোরূপের জন্য পাগল হতে হবে। অবশ্য আমি নই, যদিও আমি কালো।

কথাগুলো হয়েছিল তাদের পরিচয়ের প্রথম দিন। ঝগড়ার মধ্যে সে বিচিত্র পরিচয়।

দুই

দিল্লীর কনস্টিটিউশন হাউস। বিপাশা তখন সদ্য বি-এ পাস করেছে। মিশনের চাকরিটা তখনও নেয় নি। তাঁরা চেয়েছেন—তাকে, কিন্তু সে ভাবছে ! জীবনে তখনও সমস্যা কোন পথ নেবে। এয়ার হোস্টেস ? অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো ? কমার্শিয়াল আর্টে রিসেপশনিস্ট ? শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শিখে কোন চাকরি ? এম-এ পাস করে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ? স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে পড়ে আসা ? অথবা মিশনের ওই শিক্ষাব্রত ? মিশনের কাছে তার অনেক ঋণ। কয়েক বছর সে পড়েছে। তাদের প্রভাবও আছে এই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। সে ভাবছে। সর্দার দয়ালসিংয়ের সে-উপদেশ সে ভোলে নি। জানকে ধরম হ্যায় জিন্দগী। জিতা রহো, আনন্দ রহো পৃথিবীর প্রথম আশীর্বাদ, শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। জিন্দগী সচ্চা হ্যায় আনন্দমে, বিনা আনন্দসে জিন্দগী ঝুটা, মিথ্যা। সে তাই বিচার করে দেখছে, ভাবছে, আনন্দ সে কোন্ পথে পাবে ?

হাই-হিল জুতো পরে, বব করে বা সিংগল করে চুল ছেঁটে, লিপস্টিক-রুজে তার শুভ্র সুন্দর মুখকে এনামেল করে সোসাইটি গার্ল হয়ে বা ওই উপযোগী চাকরিতে আনন্দ, না কল্যাণধর্মী শিক্ষাব্রতে আনন্দ ? প্রথম দিকটাই নিশ্চয় সে বেছে নিত, যদি এই কয়েক বছর মিশনারীদের সংস্রবে না-আসত এবং সর্দার হরদয়াল সিংকে ভুলতে পারত ! তার যে আজও মনে পড়ে তাদের সেই পিতাপুত্রের চারজনের সঙ্গে যুদ্ধ ; পুত্রের মৃত্যু ; মৃত পুত্রকে ফেলে, তাকে কাঁধে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে পাকিস্তান সীমারেখা পার হয়ে হিন্দুস্থানে চলে আসার সেই স্মৃতি। সেই ছবি। এখন সে থাকে একটা বোর্ডিংয়ে। কনস্টিটিউশন হাউসে আসত তার বান্ধবীর কাছে। কনস্টিটিউশন হাউস বিচিত্র ক্ষেত্র ; সারা ভারতবর্ষ, শুধু তাই কেন, বহিঃপৃথিবীর মানুষকে শুদ্ধ নিয়ে সে মেলা বা জগন্নাথক্ষেত্র। কেরানী থেকে আই-সি-এস, এম-পি-দের বস-বাস এখানে। এখানে কয়েকজন বান্ধবীই তার ছিল। পুরুষ বন্ধু আজও তার জোটে নি। জোটায় নি সে। চিত্ত তার ওদিকে যেন উন্মুখই হয় নি। বরং একটু বিরূপ এবং বিমুখই ছিল। তার জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা, তার দুঃখ-কষ্ট তাকে শুধুই ঠেলত তখন---শক্ত হয়ে আগে নিজে দাঁড়াও। এই একুশ-বাইশ বছরের জীবনে, সেই বারো বছর থেকে সে তো দেখে এসেছে পুরুষের নারীদেহ-লোলুপতা। পিশাচ বর্বর পশুদের সে মূর্তি তার মনে পড়ে। তারপর অনেক—অনেক দেখেছে। পুরুষের মধ্যে প্রেমে তার বিশ্বাসই নেই তখন।

তার বান্ধবী মারাঠী মেয়ে যশোদা বাঈ তাকে বলত, ইউ সি বিয়াস, তুমি যদি মুঘল আমলে দিল্লী আসতে, তাহলে কোন্ দিন তুমি লালকিল্লার বাদশাহী হারেমে গিয়ে ঢুকতে। লাল কুঁয়রের মত তুমিই চালাতে তামাম হিন্দুস্থানের শাসন—আর বাদশা জাহান্দার শার মত কোন শাহ বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখত। এই টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির আজাদ-হিন্দুস্থানের ডেমোক্রেসীই তোমার লাককে ব্যাডলাক করে দিয়েছে।

সে বলত—তাহলে তুমিও বাদ যেতে না যশোদা। আমি অন্তত বাদশার কানে তুলে দিতাম—অমুক ঠিকানায় যশোদা বলে এক মারাঠী সুন্দরী আছে। তাকে না আনলে জাঁহাপনার হারেমের শোভায় খুঁত থেকে যাচ্ছে।

যশোদা বাঈয়ের স্বামী সেন্ট্রাল গভর্নমেণ্টের চাকরে, দিল্লীতে বদলী হয়ে এসেছিল বছর কয়েক আগে। একটি বাচ্চা। যশোদা সত্যিই সুন্দরী মেয়ে। ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কলেজে। প্রাইভেটে আই-এ পাস করে এসেছিল দিল্লীতে, এসে বি-এ দিচ্ছিল। স্বামীর উপাধি তলোয়ারকর, চাকরিই করত। এখানে এসে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগেছিল ফরেনঅ্যাফেয়ারস্-এ ঢুকে দেশান্তর ঘোরে। তাতে নিজের যোগ্যতার সঙ্গে স্ত্রীর বিদেশ-বাসের যোগ্যতার প্রয়োজন আছে। যশোদারও সে দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল। তাড়াতাড়ি বা নিশ্চিতরূপে একেবারেই বি-এ পাসের আশায় কলেজে ভর্তি হয়েছিল। আলাপ ওর সঙ্গে কলেজেই। মিশনারীদের পরিচালিত একটি মেয়েদের কলেজের সান্ধ্য-বিভাগে। সেখানে বেশীর ভাগই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ক্রীশ্চান। এরা দুজন হিন্দু বলে আলাপের ক্ষেত্রটি অনুকূল হয়ে উঠেছিল। কনস্টিটিউশন হাউসের কিচেন সহ একখানা ঘর নিয়ে যশোদারা থাকত। সেখানে সন্ধ্যার দিকে প্রায়ই আসত বিপাশা। যশোদার ছেলেটির সঙ্গে খানিকটা খেলা করে, তাকে নিয়ে খানিকটা

লোফালুফি করে সন্ধ্যে হতেই দুজনে বেরিয়ে যেত কলেজে। যশোদার স্বামী তলোয়ারকর তখন ছেলেকে নিয়ে থাকতেন। বিপাশা দিনে একটা চাকরি নিয়েছিল ওই মিশনারীদের বাচ্চা ছেলেদের স্কুলে।

কনস্টিটিউশন হাউসের আর এক বান্ধবী তার মিস সেন। চাকরি করেন রেডিয়োতে। ওরই কাছে বাংলা শিখত বিপাশা। দিল্লীতে এসে স্কুলে ভর্তি হয়ে অবধি প্রাণপণ চেষ্টায় সে বাংলা শিখেছে। বারবার তার গায়ের রঙ, চোখ ও চুলের রঙ দেখে লোকে তার বাঙালীত্বে যে সন্দেহ করেছিল—সেটা বিপাশাকে আহত করত। তাই পড়ার সুবিধা পেতেই সে চেষ্টা করে বাংলা শিক্ষার সুযোগ করে নিয়েছিল। জীবনের শুরুতেই বাপ-মাকে হারিয়ে হয়তো তার গোপন মনে বাসনাও জেগেছিল তার নিজেরই অজ্ঞাতসারে যে, একদিন কলকাতায় গিয়ে খুঁজে দেখবে তার আত্মীয় স্বজন কেউ আছে কি না। কলেজে এসে বাংলা নিয়ে পড়ায় বাধা হয়েছিল। সেই সুবিধাটা করে নিয়েছিল সে মিস সেনের কাছে। মিস সেন তার থেকে বয়সে বেশ কিছুদিনের বড়। মিষ্ট প্রকৃতির মেয়ে। গান গাইতে পারেন, অভিনয় করতে পারেন, দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন মিস সেন। প্রকৃতিতে ঠিক বিপাশার সঙ্গে মেলে না, কারণ মিস সেন সোসাইটি-ঘেঁষা মেয়ে। যশোদাই আলাপ করিয়ে দিয়েছে। যশোদা মিস সেনের কাছে সোসাইটির আইন-কানুন শেখে। দেশ বিদেশ ঘুরে এবং রেডিয়োতে চাকরি করে মিস সেন ও-সবে খুব পোক্ত। মিস সেন বিপাশাকে বলে কাশ্মীরী বেগম। উদিপুরী। সম্রাট আলমগীরের উদিপুরী গো! প্রথম প্রথম বুঝতে পারত না বিপাশা। তারপর একদিন মিস সেন তাকে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আলমগীর ও উদিপুরী রেকর্ডখানা শুনিয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ বইখানাও পড়িয়ে দিয়েছেন।

এই দুজনের কোন একজনের কাছে সে যেতই কনস্টিটিউশন হাউসে।

সেদিন, যশোদাদের ঘরটা বন্ধ, ওদের উইংয়ের পরিচারক বলেছিল—গোল-মার্কিটে গিয়েছেন মিস্টার-মিসেস, জলদি ফিরবেন। মিস সেন নেই, তিনি ডিউটিতে গেছেন। অগত্যা সে ডাইনিং হলের সামনে বইয়ের স্টলটায় কাগজ বই উল্টে দেখছিল, এমন সময় একটি কালো —অবশ্য ভারতবর্ষে যাকে শ্যামবর্ণ বলে তাই, সাহেবী পোশাক-পরা তরুণ আপন মনে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল। বাংলা কবিতা। স্বাভাবিক ভাবেই সে কান পেতেছিল।

প্রচণ্ড আবেগে যদি ঝাঁপ দিয়ে পড়ি—
তব দ্বারে করাঘাত করি—
আকুল প্রেমার্ত মোর জীবনের অর্ঘ্য তুলে ধরি—
তাও তুমি নেবে না সুন্দরী?
বশিষ্ঠের মত—

আর সে শুনতে পায়নি। লোকটি লাউঞ্জের দরজায় ঢুকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। বাংলাতে তার তখন যথেষ্ট দখল হয়েছে। উচ্চারণে একটু টান থাকলেও বেশ বাংলা বলে, লেখে আরও ভাল। বঙ্কিমচন্দ্র পড়েছে, শরৎচন্দ্র পড়েছে, রবীন্দ্রনাথও পড়েছে তবে কবিতা

সব বোঝেনি। কথা ও কাহিনীখানা কণ্ঠস্থ ; নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ মুখস্থ। বাঙালীদের এখানে ওখানে যে সব ক্লাব আছে, সে সব জায়গায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় কবিতা আবৃত্তি করেছে। কিন্তু উচ্চারণের জন্য পুরস্কার পায়নি। সেবার কালীবাড়ির আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় ওই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ আবৃত্তি করেছিল—তাতে তাকে ভিন্ন-প্রদেশিনী বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মনে করে উৎসাহিত করবার জন্য একটা পুরস্কার তাঁরা দিয়েছিলেন—কিন্তু সে তা নেয় নি। তার ট্রেনার ওই মিস সেন। তিনি হেসে বলতেন—যা শিখেছ তুমি, তা কম নয় বিয়াস। এর থেকে বেশী শিখতে হলে, কিংবা তোমার কথাবার্তা পারফেক্ট করতে হলে—খাস বাংলাদেশে যেতে হবে। তোমাকে তো বহুবার বলে দিয়েছি যে, আমরা অনেক স্থলে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করি নে। উহ্য থাকে। যেমন—জিজ্ঞাসা করছে কেউ তোমাকে—মিস সেন তোমার কে ? ওখানে ক্রিয়াটা হল—'হন', ওটা বলিনে। তুমি উত্তর দিচ্ছ—আমার বান্ধবী। বা, আমার শিক্ষয়িত্রী। এখানেও তাই, ক্রিয়া উহ্য। কিন্তু তুমি ঠিক বলবে—মিস সেন তোমার কে হচ্ছেন ? উত্তরেও বলবে, বান্ধবী হচ্ছেন। মানে 'হ্যায়'টা ভুলতে পার না। আমাদের হিন্দী পুলিস আয়েগীর স্থলে আয়েগার মত। আমার হিন্দী দিল্লীতে এসে রপ্ত হয়েছে। বাংলা রপ্ত করতে তোমার কলকাতায় যেতে হবে। নাও না—রেডিয়োতে একটা চাকরি। চলে যেয়ো কলকাতা। বাংলায় ইণ্টারভ্যুতে তুমি ফেল করবে না, এ আমি লিখে দিতে পারি।

সেদিন এই কালো স্বাস্থ্যবান তরুণটির আবৃত্তি তার ভাল লেগেছিল। বাংলা আবৃত্তি মিস সেন বেশ ভাল করেন। এ তার থেকে মন্দ করে নি। কয়েকটি লাইন শুনে অর্থ তার ঠিক উপলব্ধি হয়নি—তবে এটুকু বুঝেছিল—কোন সুন্দরীর কাছে ভদ্রলোক প্রেম নিবেদন করছেন। একটু মুখ টিপে হেসেছিল। তরুণ বয়সে পুরুষদের বড় জ্বালা ! বেচারারা !

ওঃ, কত জনকে যে কত কটু কথা, কত ধমক তাকে দিতে হয়েছে এই বয়সে ! বাপ্ ! তবে ধমক খেলেই এই প্রেম-পাগলেরা পিন-ফোটানো বেলুন হয়ে যায়।

ওঃ ! কনট সার্কাসে সে থিয়েটার কম্যুনিকেশন বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর এক প্রেমার্ত তরুণ তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজকাল পেণ্টালুন আর বুশ শার্টের দৌলতে কোন্ প্রদেশের লোক চেনা কঠিন—শুধু পাঞ্জাবীরা পাগড়ী বজায় রেখে জাত রেখেছে ; বাকী তো সব ইণ্টারন্যাশানাল। ছোকরা তাকে দেখেই তার পিছু নিয়েছিল। এবং কিছুক্ষণ ঘুরঘুর করেই মৃদুস্বরে অন্য দিকে তাকিয়ে বলতে আরম্ভ করেছিল—হ্যালো মিস ! হ্যালো মিস !

একবার পকেট থেকে একগোছা নোট বের করেছিল। গুণে দেখার ছল করে পরিমাণের বহরটা বুঝিয়ে দিয়েই বোধহয় পকেটে পুরেছিল। তিক্ত কৌতুকে সে তির্যক দৃষ্টিতে সবই দেখেছিল। সে সম্পর্কে ছোকরাও সচেতন ছিল। এবং তাতেই উৎসাহিত হয়ে একটু কাছে এসে বলেছিল, কফি হাউসে এক কাপ কফি খাওয়া সম্পর্কে কি বলেন আপনি ?

সে তার মুখের দিকে ভাবলেশহীন ভাবে তাকিয়েই ছিল, ভাবছিল—মারবে এক চড় ? অথবা স্যাণ্ডালটা খুলে পটাপট ঘা কতক ? ছোকরা সম্ভবত মৌনং সম্মতি লক্ষণং ভেবে

অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে বলেছিল --তারপর একখানা ট্যাক্সিতে কুতবমিনার পর্যন্ত ? কি বলেন আপনি ? বলেই সে একটা ধাবমান খালি ট্যাক্সিকে ডেকেছিল---ট্যাক্সি !

সঙ্গে সঙ্গে বিপাশা এবার মৃদুস্বরে ডেকেছিল-- পুলিস ! পুলিস শুনতে পায় নি, কিন্তু সেই ছোকরা শুনতে পেয়েছিল, এবং যেন আঁতকে চমকে উঠেছিল, বলেছিল---কি ? কেন ?

---পুলি-স---আবার ডেকেছিল সে একটু গলা উঁচু করে। অথচ হাসিতে তার ভিতরটা যেন ভেঙে পড়ছে।

তখন ছোকরার মুখ-চোখ শুকিয়ে এক মুহূর্তে যা হয়েছিল---তার উপমা পিন-ফোটানো বেলুন ছাড়া কিছু হয় না। ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়িয়েছে তখন, ছোকরা প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দরজা খুলে উঠতে চেয়েছিল, কিন্তু পা হড়কে পড়েছিল হুমড়ি খেয়ে। বেচারা আধখানা ট্যাক্সির মধ্যে, আধখানা বাইরে রাস্তায়। বেচারা কোন রকমে উঠে গাড়িতে বসেই বলেছিল--- চালাও ! জলদি !

ওকে ভয় দেখাতে কৌতুক করে এক পা এগিয়েছিল বিপাশা, যেন গাড়িটা ধরবে। ড্রাইভার একটু বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, স্টার্ট দিতে দেরি করেছিল। ছোকরা এবার চিৎকার করে উঠেছিল, আ---শব্দ করে।

আর থাকতে পারেনি বিপাশা—সে ফিরে হন হন করে চলে গিয়েছিল মার্কেটের কোনও নির্জন কোণে দাঁড়িয়ে প্রাণ খুলে হাসতে।

চড়-চটাও বার দুই তিন সে চালিয়েছে। এ-সবগুলো ছ্যাঁচড়া, ছিঁচকে চোরের মত। এরা বাদ দিয়েও সুস্থ সবল তরুণেরা যেন প্রেমের ক্ষেত্রে একটু বোকা-বোকা। কেউ কেউ আবার বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ে, সেটা এদের অন্তত এই ভদ্রলোকের, কবিতা আবৃত্তির মধ্যে স্পষ্ট। এ দেশেরই বা দোষ কি ? কোন দেশের পুরুষেরাই তা নয়। যুদ্ধের মত নিষ্ঠুর কঠিন ক্ষেত্রে 'মাতাহারি'রা কি খেলাই না খেলে গেছে। ভদ্রলোকের আবৃত্তি শুনে এত সব কথাই তার মনের মধ্যে পর পর ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে একটি কৌতুক-উপভোগকারিণী মনের প্রসন্নতায় বক্র হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল তার মুখে।

ঠিক এই সময়েই ফিরেছিল যশোদা। রবিবার আজ, তাই একবার মার্কেটে গিয়েছিল স্বামী-স্ত্রীতে, রাত্রে একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া করবে আজ। আজ তাদের বিয়ের অ্যানিভারসারি।

চটে গিয়ে বিপাশা বলেছিল---কিন্তু তুমি আমাকে কাল তো বল নি ?

লজ্জিত হয়ে যশোদা বলছিল---বলতাম। কিন্তু---

---কি কিন্তু ? তুমি ইচ্ছে করে বল নি !

---না মিস ভট্টচারিয়া, আমি অপরাধী---আমার কাছে শুনুন, কাল সারাটা দিন ওর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ ছিল না। উই কোয়ারেল্ড।

যশোদা বলেছিল---সে ভাই দুটো বেড়ালের মত। ও-কোণ থেকে ও এ্যাঁ-ও করেছে, এ কোণ থেকে আমি করেছি---এ্যাঁ-ও ! জান, একবার খেপে গিয়ে বাচ্চাটাকে আমি মেরেছিলাম---অ্যাণ্ড হি জাম্প্‌ড্‌ অন মি। সত্যি বলছি। থপ করে পিছন দিক থেকে

আমার বেণী ধরে টেনে বলেছিল—খবরদার, আমার বাচ্চাকে তুমি মারবে না।

নিজের হাতখানা বিপাশার চোখের সামনে ধরে তলোয়ারকর বলেছিল—দেখুন, হাতটা কি করেছে দেখুন, নখের আঁচড়ে!

বিপাশা হেসে উঠেছিল এবার, বলেছিল—ছি-ছি-ছি, পাড়া জানিয়ে করেছ তো সব! এই কনস্টিটিউশন হাউস, অলইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল মুসাফেরখানা; ছড়িয়ে গেল তো বিশ্বময়!

তলোয়ারকর বলেছিল—হলফ করে বলতে পারি, ইন দি নেম অব গড, উই কোয়ার্ল্ড বাট ভেরি সাইলেণ্টলি! একবার চাপা গলায় বলেছিলাম, বাচ্চা আমার, খবরদার মারবে না। তাও মারাঠীতে। ও-ই তার উত্তরে জোর চেঁচিয়ে উঠেছিল—কি! সব তখন ঘুমুচ্ছে অবশ্য; কেবল সামনের উইংয়ের ঘরটায় এক বাঙালী এসেছে, লোকটা জেগে কিছু লিখছিল, ও শুনেছিল। কিন্তু বাচ্চাটা সিচুয়েশন সেভ করেছে, জোর চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল। লোকটা বাইরে এসেছিল, কিন্তু বাচ্চার কান্না শুনে ভাবল, পড়ে টড়ে গেছে।

বিপাশা সকৌতুকে বলেছিল—সম্বা কালো মত তো? সেও এক পাগল। আপন মনেই হাত-পা নেড়ে কবিতা রিসাইট করতে করতে গেল, করিডোর দিয়ে! তারপর তোমাদের মিটল কি করে?

যশোদা বলেছিল—সেটা যার বিয়ে হয় নি সে শুনবার অধিকারী নয়। শুনলেও বুঝতে পারে না। ওটা বিবাহিতদেরই ওপেন সিক্রেট! তাদের একজন হলে জিজ্ঞাসাই করতে না। কথাটা!

বিপাশা বলেছিল—হ্যাঁ। বোকাদের সিক্রেট বুদ্ধিমানেরা বুঝতে পারে না। আমার বুঝে কাজ নেই। কিন্তু আমি আসছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে। বলেই উঠে বেরিয়ে গিয়েছিল। কনস্টিটিউশন হাউসের সামনেই ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড, কার্জন রোডে ফটফটিয়াও ছুটেছে মিনিটে-মিনিটে, চার আনা সিট কনট সার্কাস পর্যন্ত। সে একটা ফটফটিয়ায় সওয়ারী হয়ে কনট সার্কাস গিয়ে কিছু ফুল কিছু মিষ্টি এবং বাচ্চাটার জন্যে একটা বল কিনে নিয়ে ফিরে এসেছিল।

যশোদা এবং তলোয়ারকর দুজনেই তাকে এরপর ধরেছিল রাত্রে খেয়ে যেতে হবে। বিপাশা তা প্রত্যাখ্যান করেনি। বলেছিল—নিশ্চয়! তোমরা ভেবেছ তোমরা না-বললেও আমি চলে যেতাম? নেভার। আজ তোমাদের বিবাহিত জীবনের মধু এবং মাধুরীর অ্যানালিসিস্ করে তবে আমি যাব।

যশোদা হেসেছিল, বলেছিল—রকেট ছুঁড়ে মহাশূন্যের তথ্য জানার মত হবে আর কি।

বিপাশা ওদের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে বলেছিল—ও আমি জেনে গেছি যশোদা। এই দেখ, তার স্বাদ আমি গ্রহণ করছি।

তারপর তাকে নিয়ে সামনের মাঠে বলখেলা শুরু করে দিয়েছিল। কনস্টিটিউশন হাউসের প্রতি উইংয়ে সারিবন্দী ঘর এবং সামনা-সামনি দুই উইংয়ের মধ্যে সুন্দর একটি করে

লন। সারাটা গ্রীষ্মকাল লোকে এই লনে খাট পেতে শুয়ে থাকে, বিকেলে ছেলেরা খেলা করে, শীতকালে মৌসুমী ফুলের সমারোহে ঝলমল করে। যশোদার বাচ্চাটি স্বাস্থ্যবান ছেলে, মহারাষ্ট্রীয় দৃঢ়তা যেন ওর সর্বাঙ্গের গড়নের মধ্যে উদ্যত হয়ে আছে, রঙটা মায়ের মতই ফরসা, একমাথা কোঁকড়া চুল, গ্যালিসের মত কাপড়ের ফিতেওয়ালা হাফ-প্যাণ্ট-পরা ছেলেটির মধ্যে একটি গ্যাণ্ডো-গ্যাণ্ডো ভাব আছে; ছোটে যেন গুলবাঘের মত। পড়েও কাঁদে না। বিপাশা পায়ে ঠেলে বল ছুঁড়ে দিচ্ছিল, আর সে ছুটে গিয়ে ধরছিল, সেও পা দিয়ে মারতে চেষ্টা করছিল, মধ্যে মধ্যে পড়ছিল। বিপাশা তাকে উৎসাহিত করছিল, বাহবা মেরে লাল! সে-ও আধ-আধ ভাষায় বলছিল, বাঃ! মেলে লাল! লাল! লাল! এরই মধ্যে হঠাৎ একসময় বিপাশা শুনতে পেল সেই আবৃত্তি। খেলতে খেলতে থেমে দেখল, সেই বাঙালী ভদ্রলোক, এখনও তাঁর আবৃত্তি চলছে। ঘরের দরজা খুলে ঢুকে গেলেন। আবৃত্তি চলতে লাগল।

বহুদিন হল কোন ফাল্গুনে ছিনু আমি তব ভরসায়

এলে তুমি ঘন বরষায়;

বাঃ, বরষায় বলার কায়দা আছে ভদ্রলোকের এবং আশ্চর্য ধৈর্যও আছে, একেবারে শেষ লাইন পর্যন্ত আবৃত্তি করে গেল—

এ পরান ভরি যে গান বাজালে সে তোমার করো সায়—

আজি জলভরা বরষায়।

সে আমায় কাঁপিয়ে হেলিয়ে বেঁকিয়ে কত কায়দায় ব-রষায়!

ইচ্ছে হল একবার ব্রাভো ব্রাভো বলে বাহবা দেয়। না, বলে আসে—মহাশয়, প্রতিবেশীদের কর্ণগুলির জন্য একটু বিবেচনা করিলে অত্যন্ত সুখী হইব।

যশোদা এই মুহূর্তে ডাকলে—চা খাও।

বাইরে বারান্দায় মোড়া এবং বেতের টেবিল পাতা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে বসেছিল। ভদ্রলোক তখন থেমেছেন। সে বলেছিল, বাবাঃ! এতক্ষণে যেন থেমেছেন ভদ্রলোক। বোধহয় ক্লান্ত হয়েছেন।

যশোদা বলেছিল—উঁহু। ও যন্ত্রটি থামে না এবং দমও ফুরোয় না। কাল সকালে এসেছে, সারাটা দিন চলেছে। আমরা রাত্রে যখন ঝগড়া করছি, তখনও আবৃত্তি চলছে।

—বোধহয় কবি অথবা অ্যাক্টর! কিন্তু অ্যামেচার।

তলোয়ারকর বললেন—না। এঞ্জিনীয়ার। ভাকরা-নাঙাল দেখে পাঞ্জাব ঘুরে এসেছে। বাংলা দেশের ডি-ভি-সি দামোদর ভ্যালী—

ঠিক সেই মুহূর্তেই শোনা গেল, ও-গো—!

যশোদা বললে—ওই শুরু হলো আবার! বলছি তো—ওর জন্মক্ষণ থেকে ভগবান যন্ত্রটিতে অফুরন্ত দম দিয়ে রেখেছেন।

বিপাশা অকস্মাৎ ঈষৎ চকিত হয়ে উঠল। খানিকটা চা ছলকে পড়ে গেল টেবিল-ক্লথের উপর। যশোদা বললে—হোয়াটস্ আপ, কি হল?

—চুপ কর তো একটু !

আবৃত্তি তখন চলছে—

"অপরূপা সুন্দরী বিয়াস, তপস্বিনী কুমারী বিপাশা—"

যশোদা বললে —স্ট্রেঞ্জ ! বিপাশা !

আরক্ত হয়ে বিন্যাস বললে—চুপ কর !

"জীবনের মিটাতে পিপাসা—
তোমার তরঙ্গময়ী উজ্জ্বল যৌবনস্রোতে—
মর্ত্যসীমা গিরিচূড় হতে—
প্রচণ্ড আবেগে যদি ঝাঁপ দিয়ে পড়ি,
তল দ্বারে করাঘাত করি—
আকুল প্রেমার্ত মোর জীবনের অর্ঘ্য তুলে ধরি ;
তাও তুমি নেবে না সুন্দরী ?

উঠে দাঁড়াল বিপাশা উত্তেজনা বশে। যশোদা প্রশ্ন করলে—কি বলছে ?

তলোয়ারকর প্রশ্ন করলেন—এ কি তোমাকে বলছে ?

বিপাশা বললে—ঠিক বুঝতে পারছি নে।

—তোমাকে ও জানবে কি করে ?

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকতে বলে স্থির হয়ে আবৃত্তি শুনছিল বিপাশা। চোখের পলক পড়েনি। আবেগের সঙ্গে আবৃত্তি করে চলেছিল ভদ্রলোক। দিব্যেন্দুর তখন ভদ্রলোক ছাড়া তো অন্য অভিধা ছিল না, যদিও বিপাশার মনে হচ্ছিল, অতি বুদ্ধিমান অভদ্র ব্যক্তি। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তার ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

আবৃত্তি চলেছিল। দেখতে পাচ্ছিল বিপাশা, ঘরের ভিতর আরাম-চেয়ারে বসে হাত নেড়ে লোকটা আবৃত্তি করে চলেছে।

"আমি তো বশিষ্ঠ সম শোকতপ্ত মৃত্যুকামী নহি,
আমি আসিয়াছি আজি উন্মাদ উল্লাস রাশি বহি—
আমার জীবন পণে আসিয়াছি নিতে তোমা জিনি।
শুনিয়াছি, ওগো তপস্বিনি—
খুলিয়া সবার পাশ, সেই পাশে রয়েছ বন্দিনী।
ফিরে যেতে আমি আসি নাই—
নির্ভীক পৌরুষ বলে আমি তব ব্রতভঙ্গ চাই।
ঝাঁপ দিয়া তব জল তলে—
খুলিয়া তোমার পাশ—পুষ্পমালা দিব তব গলে।
বিপাশা ঘুচায়ে ছিল পাশ
সে কোন্ অতীতে ; আজ তুমি হয়েছ বিয়াস ;
তা ধ্বনির সঙ্গীতে ও ইঙ্গিতে প্রকাশ—

ডাকিতেছে এস প্রিয়, এস বন্ধু, মিটাও তিয়াস।
আমার বিয়াস!

শেষ হল আবৃত্তি। মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করলে বিপাশা আরও আছে কিনা বুঝতে, তারপর হন হন করে গিয়ে দরজায় টোকা মেরে বললে—মে আই কাম ইন?

—ইয়েস, প্লিজ কাম ইন—

উঠে দাঁড়িয়েছিল দিবোন্দু। এবং কুণ্ঠিত ভাবে বলেছিল—প্লিজ বি সিটেড!

—না। আপনি ও কি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন? কণ্ঠস্বর তার সংযত কিন্তু তার উত্তাপ স্পষ্ট। ইংরিজীতেই বললে সে।

দিবোন্দু বলেছিল—কেন বলুন তো? আপনি যেন বিরক্ত হয়েছেন মনে হচ্ছে!

—হ্যাঁ হয়েছি। না, চিৎকারের কথা নয়। আমি জানতে চাই, এ কবিতার কবি কে? আপনি?

—হ্যাঁ। আমার অক্ষমতা আমি জানি। কিন্তু আবেগ আমি সামলাতে পারিনি। পাঞ্জাবে বিয়াস নদীতে সাঁতার দেওয়া খুব কঠিন। আমার বন্ধুদের সঙ্গে বাজী ফেলে সাঁতার দিয়েছি এবং ডুবে জলের তলা থেকে পাথর তুলে এনেছি। বাজী জিতেছি। এই আমার ট্রফি।

টেবিলের উপর একটি গোল পাথর পড়েছিল। সেটা দেখিয়েছিল দিবোন্দু। আর দেখিয়েছিল একটা রূপোর সিগারেট কেস। বিপাশা বিস্মিত হয়েছিল গল্পটা শুনে। এবং তাতেই সে একটু থমকে গিয়েছিল। না-হলে হয়তো ঘটনাস্রোতে আকস্মিকভাবে প্রপাতের আবর্ত ও গর্জনের সৃষ্টি করতো। এক মুহূর্ত চুপ করে ভেবে দেখতে তাকে হয়েছিল, কিন্তু সবই মিথ্যা বলে মনে হয়েছিল। ওরা সব পারে। বিশেষ করে বাঙালীরা এই কল্পনার ক্ষেত্রে ওস্তাদ। সবটা মিথ্যা, সবটা বানানো। সে নিশ্চয় রাগ করে আসবে, কৈফিয়ৎ চাইবে বলে নুড়িটা রেখেছে এবং সিগারেট কেস দোকানে পাওয়া যায়। বিপাশা টেবিলের উপর থেকে নুড়িটা নিয়ে দেখে ব্যঙ্গ করে বললে—এটা বুঝি বিয়াস নদীর কুমারী-হৃদয়?

—খুব ভাল বলেছেন। চমৎকার বলেছেন। ওইটিই বিয়াসের কুমারী-হৃদয় বা তার ভগ্নাংশ।

—এই কুমারী-হৃদয়টি ছুঁড়ে যদি আপনার কপালে মারা যায় তো কেমন হয়?

বিস্মিত হয়ে দিবোন্দু বলেছিল—কেন? তা মারবেন কেন?

—কারণ, আপনি একটি চতুর মিথ্যাবাদী। যা বলেছেন তা মিথ্যা। নিছক মিথ্যা।

—তার মানে? কি বলছেন আপনি?

—ঠিক বলছি। বাঙালীরা কবিতায় গল্পে ওস্তাদ। মিথ্যে খুব বানাতে পারে। আপনি কাল সন্ধ্যেতে এই কবিতা রচনা করেছেন, এখানে বসে; ওই ঘরে আমাকে দেখে, আমার নাম শুনে। আমার নাম বিপাশা—ডাক নাম বিয়াস। শরৎচন্দ্রের সেই বাঙালী ছেলে যে বর্মী মেয়েটির কাছে মিথ্যে কান্নার সুরে, বাংলায়—'তোর ওই হাতের আংটিটাও দে রে নিয়ে যাই'—বলে প্রতারণা করেছিল, তাতে আপনাতে কোন প্রভেদ নেই। একটু ভুল আপনার

হয়েছিল—আপনি জানতেন না যে, আমি বাংলা জানি।

এতগুলো মারাত্মক অভিযোগের কথা দিব্যেন্দুর কাছে ওই শেষের কথাটায় চাপা পড়ে গিয়েছিল—সে সবিস্ময়ে বলেছিল—আপনি বাংলা জানেন?

—জানি না তো কবিতাটা নিয়ে এত প্রশ্ন করলাম কি করে?

—তাই তো!

এবার বিপাশা বাংলাতেই বলেছিল, এতক্ষণ ইংরিজীতেই কথা হচ্ছিল, বলেছিল—আমি বাংলা জানি, আমার নাম বিপাশা, এবং বিয়াস সে আগেই বলেছি—তা আপনি জানেনও। এবং আমি নিজে বাঙালী।

—আপনি বাঙালী? বাঙালীর মেয়ে? অসম্ভব। ইংরিজীতে বলেছিল দিব্যেন্দু। বোধ হয় ভুলতে পারছিল না, বিপাশার চমৎকার ইংরিজী এবং তার গায়ের রঙ।

—বাংলায় বলুন। অনেক অশুদ্ধ খারাপ ইংরিজী শুনেছি। বাংলায় বলুন।

—বাঙালী আপনি? মানে বাংলাদেশেই জন্মেছেন—

—না—না। আমি বাঙালীর মেয়ে বাঙালী। বাঙালী হলেই গায়ের রঙ সাঁওতালদের মত কালো হয় না এবং আচারে-ব্যবহারে তারা বর্বর অসভ্য হয় না আপনার মত। অসভ্য, বর্বর, মিথ্যাবাদী কোথাকার!

বলেই সে হন হন করে চলে আসছিল।

দিব্যেন্দু এবার ডেকেছিল—শুনুন!

—কি?

—আপনার রঙের আর রূপের খুব অহঙ্কার? না? আর মর্যাদারও খুব তেজ! না?

—নিশ্চয়! সেটা মিথ্যে নয়।

দিব্যেন্দু ঘাড় নেড়ে বলেছিল—আপনি বাঙালীও নন—ভারতবর্ষীয়ও নন।

—কি বলছেন আপনি!

—ঠিক বলছি। হলে আমি কালো বলে সাঁওতাল বলতেন না।

—ইস্কাপন চিরদিনই ইস্কাপন।

—ওটা ইংরেজের কথা। ভারতবর্ষের কালো ইস্কাপন নয়। কালো হচ্ছে তার জীবন আলো-করা রূপ। আপনি জানেন—আর্যদের রাঙাটে সাদাটে রূপ এখানে এসে চোখে চুলে কালোকে শিরোধার্য করে ধন্য হয়েছে? পাঞ্জাব কাশ্মীর যান প্রমাণ পাবেন। সাদা দেবতা শিব এখানে কালো মেয়ের পায়ের তলায় ধন্য হয়েছে। গৌরী রাধারা কালোর প্রেমে ঘর ছেড়েছে। ভারতবর্ষে মানুষের মধ্যে দু'জন ভগবানের অবতার। একজন রাম, একজন শ্যাম! শুভ্রবর্ণগরবিনী আপনি এ দেশের মেয়ে হলে—আপনিও একদিন কালো কারুর জন্যে পাগল হবেন। আমি নির্দোষ। আমাকে কটু বললেন বলে কটু ভাবেই বললাম।

কথার বাঁধুনী শুনে অবাক হয়েছিল বিপাশা।

দিব্যেন্দু একটু হেসে বলেছিল—আমি বলছি না যে আমার জন্যে। কারণ আমিও কালো।

তলোয়ারকর কখন এসে ঘরের দোরে দাঁড়িয়েছিল। সে এবার এসে ঘরে ঢুকেছিল। ইংরিজী কথাবার্তা সবই সে বুঝেছিল, বোঝেনি শুধু বাংলাটুকু। সে এসে বিপাশাকে বলেছিল, মিস ভট্টাচারিয়া, যশোদা ডাকছে তোমায়। আর না। যথেষ্ট হয়েছে। তুমি যাও—আমি ওঁর সঙ্গে দুটো কথা বলে যাই।

বিপাশা চলে এসেছিল। এবং তিক্ত-বিরক্ত চিত্তে চুপ করে বসে ছিল। এতক্ষণে তার যেন সবটা খতিয়ে দেখার অবকাশ হয়েছিল। ভাবছিল, হয় তাকে সত্যিই শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল, নয় এতটা করা উচিতই হয় নি। ভাবছিল, কালই সে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে সব জানাবে। ও কে, ওর ঠিকানা—কনস্টিটিউশন হাউসের রিসেপশনেই পাওয়া যাবে। আইনমত এর প্রতিকারে তার সাধ্য নাই, কিন্তু স্বাধীন ভারতে এই ভাবে কোন কুমারীর অপমান করলে কি কোন প্রতিকার হবে না?

ঠিক এই সময়েই ফিরে এসেছিল তলোয়ারকর। হাতে একখানা উর্দু হরফে ছাপা কাগজ। মফস্বলের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। তলোয়ারকর বলেছিল—একটু বেশী করে ফেলছ বিপাশা।

ভুরু কুঁচকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সে।

হেসে তলোয়ারকর বলেছিল—কাগজটা পড়। জম্মুর কাগজ।

—কি আছে ওতে?

—ও সত্যিই বাজী রেখে বিয়াসে সাঁতার দিয়ে এপার-ওপার করেছে, ডুব দিয়ে নীচ থেকে পাথর তুলছে। ওরা কয়েকজন এঞ্জিনীয়ার বেড়াতে গিয়ে কাণ্ডটা করেছিল। তাই বেরিয়েছে কাগজটায়।

কাগজটা নিয়ে পড়তে বসেছিল বিপাশা।

খবরটা সত্য। একটু স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে বলেছিল—তাই তো!

যশোদা হেসেছিল খুব। তুমি তো খুব ওকে বকে দিলে! ওঃ, কি বকুনী! পাথরটা নিয়ে বলে, কুমারী-হৃদয়টি কপালে ছুঁড়ে মারলে কি হয়? তুমি ভাই ল-ইয়ার হও!

বিপাশা তলোয়ারকরকে বলেছিল—ভদ্রলোককে ডাকুন না মিঃ তলোয়ারকর! তলোয়ারকর বেরিয়ে গেলেন—মিঃ চ্যাটার্জী!

আবার ডাকলে—মিঃ চ্যাটার্জী! সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন।

বিপাশাও বেরিয়ে এসে দাঁড়াল।

তলোয়ারকর তখনও উইংয়ের ভদ্রলোকের বারান্দায়, ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছেন—এ যে তালা দেওয়া দেখছি! বেরিয়ে গেলেন।

বিপাশা থাকতে দিব্যেন্দু ফেরেনি। পরদিন গিয়েও দেখা পায়নি। দিব্যেন্দু চলে গিয়েছিল। তলোয়ারকর তার হয়ে মাপ চেয়েছিলেন। দিব্যেন্দু বলেছিল—মাফ কিসের। ও তো একটা সুন্দর পরিহাস হয়ে গেল। অম্ল-মধুর।

তলোয়ারকর হেসে বলেছিল—ভদ্রলোক মুগ্ধ হয়ে গেছে তোমাকে দেখে।

যশোদা ঠাট্টা করেছিল—কথায়, না, রূপে?

—দুইয়েই। তবে বার বার প্রশ্ন করেছিল—বাঙালী? আশ্চর্য তো! মা পাঞ্জাবী হলেও, চুল-চোখ-রঙ! আশ্চর্য তো!

তিন

তার এই বাইশ বছরের জীবনে একটা যুগান্তর ঘটে গেছে—সমাজে দেশে। শুধু তাই বা কেন—সারা পৃথিবীতে। গোটা পৃথিবীটা একটা আগ্নেয়গিরির মত অগ্ন্যুদ্গার করলে। ভূমিকম্প হল। এর মধ্যে কত জন পুড়ে ছাই হল—কত জনে গড়িয়ে কোথা হতে কোথায় গেল, তার হিসেব এত লম্বা যে, মনে করতে বসে মনের খাতা খুলেও মনে করা যায় না। ছোটখাটো ঘটনা-গুলো যেন—একদফা, আর একদফা—আবার একদফা বিবিধ খরচ বাবদ একটা সমষ্টিভূত অঙ্কের মত হয়ে গেছে। এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে এত দিনে কাদার তাল জমে শক্ত হয়ে যাওয়ার মত নিরেট বস্তুতে পরিণত হয়েছে। নিজেও ওই কাদায় তাল হয়ে-যাওয়া বহুজনের সঙ্গে একসঙ্গে ঠাসা হয়ে কোন একটা শ্রেণীর তালের মধ্যে হারিয়ে যায়নি—এই টের। ভাগ্যই হোক, আর ঘটনা-বৈচিত্র্যের আনুকূল্যে হোক, নিজে সে একটি পাথরের মত বা নুড়ির মত নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে—পাঞ্জাব থেকে দিল্লি—দিল্লি থেকে বিহারের প্রান্ত-সীমায়, পাঁচেৎ-মাইথন এলাকা পর্যন্ত, অন্তত হাজার মাইল পথ এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত দশটা বৎসর সে চলে এসেছে এবং তার কেটে গিয়েছে। এর মধ্যে এত ঘটনা, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পর পর ঘটে গেছে যে, ওই হিসেবের এক এক দফা বিবিধ খরচ জমার মত জমাট-বাঁধা পৃথক করে মনে করা যায় না। মানুষও মনে পড়ে না। মনে পড়ে সর্দার হরদয়াল সিংকে—তাঁর সঙ্গে সেই কয়েকটা বিচিত্র দিন—সে তার অবিস্মরণীয় কয়েকটা দিন; অক্ষয় সম্পদ তার জীবনে। দিব্যেন্দুর সঙ্গে ওই প্রথম সাক্ষাতের বিচিত্র কলহ এবং তার শেষ—এটিও একটি তেমনি ঘটনা। আশ্চর্য লোক—সবল স্বাস্থ্যবান, লম্বা টিকলো নাক, টানা চোখ, ভারী গলা, খাগলা-পাগলা মানুষ; কালো রঙের গরবে শুধু গৌরবান্বিত বোধই করে না, সে-কালের দুর্বাসা-বিশ্বামিত্রের মত অভিসম্পাতও দেয়; বেশ সুন্দর সরস ভাষায়—'ওগো শুভ্রবর্ণগরবিনি! কালোকেই তোমাকে ভালবাসতে হবে। অবশ্য আমাকে নয়—যদিও আমি কালো।' তার মধ্যে তীব্রতার চেয়ে রসজ্ঞানের পরিচয়ই ছিল বেশী। স্মৃতিটি তার কাছে জীবনের 'অম্ল-মধুর' স্মৃতির শ্রেষ্ঠ স্মৃতি।

বাকীগুলির, অন্তত যা তার মনে রেখাপাত করেছে তার কিছু অতি-তিক্ত, কিছু অমৃত-মধুর। সবই প্রায় তার এই শুভ্র দেহবর্ণ, চোখ চুল—যা ইওরোপের রূপের আভাস দেয় তাই উপলক্ষ্য করে। এটা এসেছে তার মায়ের দিক থেকে। মা ছিলেন পাঞ্জাবী পণ্ডিতের কন্যা। মাতামহ নাকি খ্যাতিসম্পন্ন নিষ্ঠাবান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বাড়ি ছিল বিপাশার তটে একখানি গ্রামে। মিয়ানি শহরের কাছে। তাঁদের বংশে নাকি এই ধরণের রূপের মধ্যে মধ্যে বিচিত্র আবির্ভাব হত। বারবার ফলিত সত্য হিসাবে মাতামহ বংশের বিশ্বাস ছিল—এই রূপ যখন পুত্রকে আশ্রয় করে আসে, তখন বংশের সমৃদ্ধি হয়, খ্যাতিতে রাজপ্রতিষ্ঠা আসে; আর মেয়ে হলে—আসে

বিপদ, প্রচণ্ড আঘাত পড়ে বংশে ওই মেয়েকে উপলক্ষ্য করে। শর্মা-বংশ প্রাচীন বংশ। আদি পুরুষ থেকে মাতামহ চতুর্মুখ শর্মাচার্য পর্যন্ত বহু শাখায় বিভক্ত; কাশ্মীর পাঞ্জাব জুড়ে ছড়িয়ে আছে। সব শাখাতেই এমন আবির্ভাব হয়েছে এবং এমন ঘটনাই ঘটেছে। কাশ্মীর জম্মুতে, পশ্চিম পাঞ্জাবে, ঝিলমের ধারে তিনটি নামী ব্রাহ্মণ জমিদার জায়গীরদার বংশ আছে, যাদের ঘরে জন্মেছিল এমনি রূপের ছেলে। একটি শাখা মুসলমান হয়ে গেছে—সিন্ধুর ধারে তাদের ঘরে জন্মেছিল এমনি মেয়ে। মেয়েকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল এক নবাব। দুটি শাখা আছে, যাদের ঘরের কন্যার জন্য গোটা পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণ-বংশ লালায়িত। তার কারণ, এমনই রূপের দুটি মেয়ের রূপের জন্য যখন শক্তিমদমত্ত দেহভোগীরা লালায়িত হয়ে এসে চড়াও করলে, তখন একজন শিবিকার মধ্যে বিষ খেয়ে মরেছিল এবং একজন নিজের হাতে চিতা জেলে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে জওহর ব্রত উদ্‌যাপন করেছিল। এক শাখা গুরু নানকের সময়েই তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে গিয়েছিল। তাদের বংশে জন্মেছিল এমনি এক মেয়ে, কালটা তখন ভীষণ কাল। নাদির-শাহী আমল সদ্য কেটেছে, শাহ দিল্লী পাঞ্জাব শ্মশান করে চলে গিয়েছে বছর খানেক কি বছর দুয়েক—তখন জন্মেছিল এই মেয়ে। শলা-পরামর্শ অনেক হয়েছিল, এ মেয়েকে রাখা উচিত হবে কি না সে নিয়ে। মমতা জয়ী হয়েছিল। কিন্তু তার ফল ফলেছিল ঠিক। আমেদশা আবদালী এল হিন্দুস্তানে। দিল্লীর হারেম থেকে দুই বাদশাজাদির সঙ্গে যখন মথুরা পর্যন্ত এলাকার হাজার হাজার মেয়েকে তারা বাঁদী করে লুঠে নিয়ে যায়; তখন তাদের বংশের এই মেয়ে নিয়ে এদের ঘরে জ্বলেছিল আগুন। বাপ নিজে হাতে বেটিকে কেটে আফগানদের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হয়েছিল। মা এক ছেলে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল কোন সুদূর দেহাতে। সেখান থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছিল অমৃতসরে। এক পুরুষ বাদে ছেলের এক ছেলে হয়েছিল—এমনি ছেলে। সে ছেলে পাঞ্জাব কেশরী হরিসিং-এর সঙ্গে কাবুল লুঠে এসেছিল। সর্দার হরিসিং-এর পাশেই থাকত এই সর্দার—কালো ঘোড়ার উপর লালচে চুলদাড়ি, পিঙ্গল চোখ, এই সওয়ার ছিল আফগানদের বিভীষিকা। সর্দার নিজেও মরেছিল যুদ্ধে এবং এ-বংশ এখানেই শেষ।

মায়ের কাছে শোনা তার এ সব কথা। তার মা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন না, বাঙালী ব্রাহ্মণ-পুত্রের সঙ্গে বিবাহই তার অন্যতম প্রমাণ। মিয়ানি স্কুলে তরুণ অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তখন সবে এসেছেন। লাহোরের বাঙালীদের কালিবাড়ীর বাঙালী ব্রাহ্মণ পূজারীর ছেলে। লাহোর ইস্কুলে এবং কলেজে পড়ে বি. এ. পাস করেছেন দর্শনে। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল বেদ অধ্যয়নের। মাতামহ তখন গ্রাম থেকে শহরে গিয়েছেন, ইস্কুলেই সংস্কৃতের শিক্ষকতা করেন। সামান্য ক্ষেতি আর যজমানদের যজ্ঞ করে আর সংসার চলে না। নতুন জমানা তখন আসছে। লাহোরে জালিওনওয়ালাবাগ হয়ে গেছে। ১৯৩২ সাল। সংসারে স্ত্রীর এবং একমাত্র কন্যা বিপাশার মা, বেদবতী তখন কিশোরী। একটি ছেলে ছিল, সে মারা গেছে। কন্যার ছিল পরম সমাদর। বেদবতীকে কালের হাওয়ায় ইস্কুলে পড়াচ্ছিলেন। সে সেবার ইস্কুলের শেষ পরীক্ষা দেবে। নগেন্দ্রনাথ তাকে কিছুদিন পড়িয়েছিলেন। তা থেকেই দুজনে দুজনের প্রতি অনুরক্ত হন। তাই নগেন্দ্রনাথের প্রতি কন্যার অনুরাগ লক্ষ্য করে পণ্ডিত চতুর্মুখের স্ত্রী যখন শঙ্কিত হয়ে স্বামীকে

সাবধান করলেন, পণ্ডিত চতুর্মুখ বলেছিলেন—দাঁড়াও, আগে নিশ্চিত হয়ে নিই। কন্যাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মা, এ কি সত্য ?

কন্যা নতমুখী হয়ে নিরুত্তর ছিল। পণ্ডিত চতুর্মুখ বলেছিলেন—নিরুত্তর থাকলে তো চলবে না মা। আমার যে সঠিক জানা প্রয়োজন। উত্তর যে আমার চাই।

বেদবতী এবার বলেছিলেন—হ্যাঁ !

চতুর্মুখ শাস্ত্রী শর্মা এবার নগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তারপর নিজেই উদ্যোগী হয়ে বিবাহ দিয়েছিলেন। স্ত্রীকে বলেছিলেন—জমানা বদলেছে। মনকেও বদলাও। কন্যা সুখী হবে। আর নগেন্দ্রনাথ বাঙালী হোক—ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ।

তখন ১৯৩৪ সাল।

১৯৩৮ সালে জন্মেছিল ওই মাতামহের গ্রামের বাড়িতে বিপাশার তটপ্রান্তে এই শুভ্রবর্ণ, নীল-নয়না, স্বর্ণাভকেশিনী কন্যা !

বেদবতী শিউরে উঠেছিলেন। এ কি হল ! তার পিতৃবংশের অভিশাপ এসে লাগল তার সংসারে ! বাঙালীকে বিবাহ করার জন্য।

নগেন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন—তাহলে এবার উল্টো হবে। আপনাদের কুলে পুত্র এনেছে সমৃদ্ধি -কন্যা এনেছে বিপদ, এবার কন্যার বংশে এসে কন্যা আনবে সমৃদ্ধি, পুত্র আনবে বিপদ।

তখন পণ্ডিত চতুর্মুখ কন্যা-জামাতাকে রেখে ঋষিকেশে চলে গেছেন। তাঁর স্ত্রী, বেদবতীর মা মারা গেছেন। ঋষিকেশ থেকে তিনি পত্রযোগে জানিয়েছিলেন, আমার মনে হয় নগেন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন। এ কন্যা শুভ সমৃদ্ধিদায়িনী হবে। আনন্দের কারণ হবে। শোক-দুঃখকে দূর করবে। ওর নাম রেখো বিপাশা। বিপাশার মত শোক-দুঃখপাশ মোচন করবে ও ; বিপাশার তটে ওর জন্ম। নগেন্দ্রনাথের নাম পছন্দ হবে কিনা জানি না, কারণ বাঙালী মেয়েদের নাম বড় আধুনিক, তবে আমার কথা মানলে সুখী হব।

নগেন্দ্রনাথ খুশী হয়ে স্ত্রীকে বলেছিলেন—পণ্ডিত চতুর্মুখের কথা মিথ্যা হবে না। ও আমাদের বিপাশা। দুঃখ যখনই পাশে জড়াবে, তখনই ডাকব—বিপাশা, 'ডুরি' খোল দে মা। ব্যাস, খুলে যাবে। ডাক নাম হবে বিয়াস।

মিয়ানি থেকে বাবা এসেছিলেন শিয়ালকোটে। তখন এম. এ. পাস করেছেন প্রাইভেটে। এবং শিক্ষক থেকে হয়েছেন অধ্যাপক। তখন তার বয়স পাঁচ-ছ বৎসর। মা মারা যান যখন, তার বয়স দশ। ১৯৪৮ সালের প্রথম। এর মধ্যে এই আলোচনা সে অনেক শুনেছে। মাসে একদিন বা দু-দিন এ আলোচনা উঠতই। বাড়িতে চারটে ভাষার প্রচলন ছিল। গুরুমুখী, উর্দু, বাংলা, ইংরিজী। সে যতক্ষণ থাকত, ততক্ষণ আলোচনা চলত ইংরিজীতে নয় বাংলায়। গুরুমুখী আর উর্দু তার মাতৃভাষা, জন্মমৃত্তিকার ভাষা, বাংলা তার পিতৃভাষা, ইংরিজী তার শিক্ষার ভাষা। মা ছিলেন রুগ্ন, প্রথম জীবনে রুগ্ন ছিলেন না ; তার জন্মের পর দ্বিতীয় সন্তান হয়েছিল ছেলে, তৃতীয় সন্তানও ছেলে, তারা সূতিকাগারেই মারা যায় এবং মায়েরও জীবন সংশয় হয়। ফলে তিনি রুগ্নই হয়ে গিয়েছিলেন। রুগ্ন দেহে এ আলোচনা করতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে

উঠতেন, তাঁর খেয়াল থাকত না যে, সেখানে সে-ও উপস্থিত আছে। বাবা বলতেন—বেদবতী, ডোন্‌ট্ ফরগেট। বলে ইশারা করে তাকে দেখিয়ে দিতেন। প্রথমে মা চুপ করতেন। প্রথম প্রথম সে-ও ধরতে পারত না। তারপর মা-ও থামতেন না, সে-ও বুঝতে পারত। মা বলতেন —নো, সি মাস্ট নো।

বাবা বলতেন—বিয়াস, যাও, বাইরে খেলা করগে।

সে উঠে গিয়েও বাইরে আড়াল থেকে শুনত।

বাংলা ইংরিজী যতদিন ভাল আয়ত্ত না হয়েছিল, ততদিন সব বুঝতে পারত না। বাবা তাকে মিশন ইস্কুলে পড়তে দিয়েছিলেন। বাড়িতে ইংরিজী তিনিই শেখাতেন, বাংলাও শিখেছিল তাঁর কাছে। তিনি কথা বলতেন তার সঙ্গে বাংলাতে।

আজ মনে পড়ে—রবীন্দ্রনাথ সে কিছুতেই বলতে পারত না। বলত—রবীন্দরনাথ।

বাবা ইংরিজীতে বলতেন, নো, নট রবীন্দরনাথ, সে—রবীন্দ্রনাথ।

ইংরিজীতে—চেষ্টা করে রবীণ্দ্রনাথ এসেছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আসে নি। বাবার নাম নগিন্দরনাথ থেকেই গিয়েছিল—দিল্লী আসা পর্যন্ত। তাই বা কেন, তারও অনেক পর পর্যন্ত। তার মা তার বাবার কাছে বাংলা খারাপ শেখেন নি, কিন্তু উচ্চারণ তাঁর এমনিই ছিল, বলতেন, ভাগ্য রোখ্‌তে পারো নাই কথা সত্য হয় না। তুমি বললে ভি সত্য হয় না। সাধনা থাকলে রোখতে তুমি পারো। আগে থেকে জানলে বেবাস্থা করতে পার। তুমি ইংরাজী শিখাচ্ছো, মেম বানাচ্ছো মেয়েকে, পথ তো তুমিই খুলে দিচ্ছ। এ কন্যার বিপদ আসে, কোন বিপদ আসে। হিসাব করো। ধরম নাশ হয়। ধরম রাখতে গেলে কন্যার জীবন যায়। সংসার নষ্ট হয়। কন্যাকে মেমসাহেব বানাচ্ছ—তুমি তো নিজে হাতে ধরম ওর নাশ করছ।

বাবা নগেন্দ্রনাথ অনেক বুঝাতেন। বলতেন—দেখ, আমাদের ধর্মে নিজেকে মেরে ধর্ম বাঁচানো, সেটা তো হেরে যাওয়া। আমি ওকে এমন বিদ্যার বল দিচ্ছি, যাতে মরবার আগে ধর্ম যে নাশ করতে আসবে, তাকে সে মারতে পারবে।

তার মা তিক্ত হাসি হেসে বলতেন—হাঁ, তুমি বাঙালী, তুমি বলছ ই কথা, সাজছে! কিন্তু তোমার সরম হওয়া উচিত ছিল—আমার কাছে এ কথা বলতে। পাঞ্জাবের মেয়ের কাছে ই কথা বলছ তুমি!

একদিনকার কথা তার মনে আছে। বাবার ছিল অসাধারণ সহ্যশক্তি এবং কথা ছিল মিষ্ট, কিন্তু সেদিন সহ্যশক্তি বোধহয় ভেঙে পড়েছিল, তাই কথাও হয়েছিল ধারালো, এবং কণ্ঠস্বর হয়েছিল তীক্ষ্ণ—দেখ, তোমরা পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ, ভারতবর্ষে তোমরা বীরও রটে—আর্যবংশের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও করতে নিশ্চয় পার। কিন্তু একটা কথা ভুলে যেয়ো না—দুনিয়া একজায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। দুনিয়াও নেই, মানুষের বিদ্যা-জ্ঞান—তাও নেই; সবই সেকালের ভাল ছিল, সে জমানাই সচ্চা, আর এ জমানা ঝুটা এ ভাববার কোন কারণ নেই। আগে গ্রহণ কি করে হত, জানত না, ভাবত রাহুতে খাচ্ছে। এখন তা ভাবে না, কারণটা জানা হয়েছে। আগে জানত না ভূমিকম্প কেমন করে হয়, এখন জেনেছে। তাতে দুনিয়ায় অকল্যাণ হয়নি। সেটা আমরা বাঙালীরা যদি

তোমাদের আগে জেনে থাকি, তবে মিছে বাঙালী বাঙালী বলে চিমটি কেটে কি লাভ? ও স্বভাবটাই হল মূর্খের।

তার মায়ের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল, তুমি এমন করে কথা বলছ আমাকে?

কথাবার্তা বাংলায় শুরু হয়েছিল; কিন্তু মাঝখান থেকেই পাল্টে শুরু হয়েছিল গুরুমুখীতে।

বাবাই শুরু করেছিলেন, বোধহয় ভেবেছিলেন, বাংলায় বললে মা সব ঠিক কি ধরতে পারবে না। মায়ের কথার উত্তরে বাবা হেসে হেসে সস্নেহে বলেছিলেন—মাফ করো বেদবতী। আমার মেজাজটা কেমন ঠিক ছিল না। কিন্তু তুমি খানিকটা অবুঝের মত কথা বলছ না? তুমি ভেবে দেখো।

---ক্যা দেখুঙ্গী শোচকে? যা হবার তা এই এমনই করেই হয়।

—না। ভেবে দেখ তুমি। তোমাকে আমি তো বুঝিয়ে বলেছি অনেকবার, সৃষ্টির বিধান-বৈচিত্র্য কতকাল আগের কোন পূর্বপুরুষের এমন রূপ হয়েছিল। হয়তো যে প্রথম পূর্বপুরুষটি মধ্য-এশিয়া থেকে এসে এখানে তোমাদের বংশস্থাপন করেছিলেন, তার হয়তো এমন রূপ ছিল। কিংবা কেউ এনেছিলেন জয় করে ইউরোপ থেকে, বা যে-সব গ্রীকরা এসেছিলেন এখানে, তাদের কোন কোন কন্যাকে জয় করে নিয়েছিলেন—তাঁর ছিল এই এমনি রূপ। সেই রূপ বিচিত্র নিয়মে কয়েক পুরুষ পরে পরে এইভাবে প্রকাশ পায়। এ রূপটি বিচিত্র। বিশেষ করে সূর্য-দেবতার আশীর্বাদ-ধন্য এই ভারতবর্ষে। এ হল ঘন সবুজের দেশ, শ্যামশোভার দেশ। এখানে এ রূপ বহুর মধ্যে এক। কাজেই এ রূপ নিয়ে সে-কালে মারামারি কাটাকাটি হত। রাজারা খেপত, নবাবরা খেপত, জমিদারেরা খেপত। ডাকাতেরাও খেপত। ডাকাত অবশ্য সবাই। কিন্তু সে কাল আজ আর নেই। কাজেই দুদিক দিয়ে ভেবে দেখ যে, এ মেয়ে অভিসম্পাত নিয়ে জন্মেছে, এমন দুর্ঘটনা ঘটবেই—এ-ভাবা ঠিক নয় বেদবতী। ওটা কাল আর পাত্র এই দুয়ের জন্যেই ঘটত। কাল পালটেছে, সুতরাং ও আর ঘটবে না। আবার পুরুষ বেলাতেও তাই; এমন পুরুষের একটা প্রতিষ্ঠা হত সেকালে। দলপতি হয়ে যেত। দলপতির, রাজার, সবায়ের নজর পড়ত। দুটোই যে একেবারে গেছে তা বলব না---তবে ওটাকে ভাগ্যচক্রের একটা বাঁধা ছকের মধ্যে ধরলে ভুল হবে। তা-ছাড়া, ধর্ম জাত এ নিয়ে গোঁড়ামিও কমছে ক্রমশ।

বেদবতী বলেছিলেন—হ্যাঁ, জমানা বদল হয়েছে। এখন হয়তো ওকে কেড়ে নিয়ে যাবার দরকারই হবে না। আমি যেমন জোয়ানীর আবেগে উচ্ছ্বাসে, বাংগালীবাবুর মহব্বতিতে অন্ধা হয়েছিলাম, ও তেমনি কোন ইংরেজ কি কোন মুসলমান, কি অন্য কোন দেশের কো। নও-জওয়ানের সঙ্গে মহব্বতি করে এসে বলবে—ওকেই আমি শাদী করব। তুমি বলবে, নিশ্চয়, বাধা কিসের? হায় আমার নসীব!

তার বাবা আর কিছু বলেননি; উঠে চলে গিয়েছিলেন।

সেই দিন তার মা তাকে ডেকে সব কথা গুছিয়ে বলেছিলেন। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছিল। শেষ বলেছিলেন—তোর বাপ ইজ্জত মানে, কিন্তু দেখছি ধরমকে ঠিক মানে না। আমার নসীব। ও বুঝতে পারে না, ধরমকে বাদ দিয়ে ইজ্জতের মানে হয় না। রবীন্দ্রনাথের কথা কাহিনী পড়েছিস বেটী? পড়বি। বুঝতে পারবি। দেখবি, এই পাঞ্জাবের শিখলোকের

কাহিনীয়া, ইতিহাসের বানানো গল্প নয়। দেখতে পাবি, ধরমের পর বিশ্বাস না থাকলে ইজ্জতের ওই জলুস, ওই জোস, ওই মহিমা হয় না রে! নবাব বললে—বেণী কেটে দাও সর্দার—বাস, তোমার ছুটি। সর্দার বললে—উসকে সাথ, শির ভি তুঙ্গা নওয়াব, কুছ যাস্তি লেও। গুরু বান্দা আপনার লেড়কার কলিজায় ছুরি বসিয়ে মারলে। নওয়াব বললে—ধরম ছোড়ো, নেহি তো আপনা হাঁতসে লেড়কাকো উথাড়ো। গুরু ধরম রাখলে, বাচ্চার কলিজায় ছুরি বসালে, বাচ্চা শেষতক পুকায়লে, ওয়া গুরুজীকি ফতে। অলখ্ নিরঞ্জন! যঁহা ইজ্জত হ্যায়, হুঁয়াই ধরম হ্যায়। যঁহা ধরম নেহি, হুঁয়া ইজ্জত নেহি। থাকতেই পারে না। কথনও যেন ধরম ছাড়িস নে! এই বাত আমার তোকে বলা রইল।

সেদিন শুনতে শুনতে তার বারবার কান্না পাচ্ছিল। আবেগে সে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিল। মায়ের কথা শেষ হলে সে বলে উঠেছিল—মা!

—হাঁ। বেটী!

—আমি জহর খেয়ে মরে যাব? বাবাকে লুকিয়ে?

শিউরে উঠে মা বলেছিলেন—না রে বেটী, কভি না। মরবি কেন? তা তো বলিনি আমি! মরণা তো এক মিনিটকে বাত। মরণা হ্যায়, তো লড়াইসে, তেজসে মরণা হ্যায়। পহেলা মারনা হ্যায় পিছে মরণা হ্যায়। ডরনা নেহি হ্যায়। ধরমকে ইজ্জতকে প্রেমসে মরণা হ্যায়, একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তবে শুধিয়ে নিস তোর পিতাজীকে, তোর ধরমটা কি!

* * *

মায়ের মৃত্যুর এক বৎসর পর যেদিন স্বাধানতার আনন্দ-উল্লাসকে আঘাত করে এল দাঙ্গা, জ্বলে উঠল সমস্ত পাঞ্জাব, যেদিন তার বাবা তাকে নিয়ে একটা দলের সঙ্গে শিয়ালকোট ছাড়লেন, সেইদিন সকালবেলা, তিনি তাঁর মুখের দিকে যেন এক বিচিত্র বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

সে ভয় পেয়েছিল। বলেছিল—কি বাবা?

বাবা বলেছিলেন—কিছু না। বলে চলে গিয়েছিলেন ঘর থেকে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলেছিলেন—তোকে আমি মিশনারীদের ওখানে পাঠিয়ে দেব। পাঞ্জাবী সালোয়ার ছেড়ে তুই ফ্রক পরে নে।

সে প্রশ্ন করেছিল—কেন বাবা?

বাবা বলেছিলেন—দেখছিস তো মা, কি হাল চারিদিকে। ওখানে তুই নিরাপদে থাকবি। এর পর সব থামলে আমি তোর খোঁজ করে নিয়ে যাব।

মেয়ে চুপ করে থেকে বলেছিল—ওরা যদি তখন ছেড়ে না দেয় বাবা? ক্রীশ্চান করে দেয়? মিশনে তো ক্রীশ্চান ছাড়া থাকতে কেউ পায় না!

বাবা চুপ করে ছিলেন।

বিপাশা আবার বলেছিল—ওরা যদি ওখান থেকে জবরদস্তি ছিনিয়ে নেয় বাবা? আমাকে তো আমার চোখ আর চুলের জন্যে অনেকে চেনে।

তার মনে তখন সেই মায়ের শোনানো গল্প যেন ধ্বনিময় হয়ে মনের মধ্যে বেজে চলেছিল—

স্মৃতির মধ্যে যেন গ্রামোফোন রেকর্ডের মত মায়ের কণ্ঠস্বরে কথাগুলি ধ্বনিত হচ্ছিল।

উত্তর পায়নি বাপের। সে আবার প্রশ্ন করেছিল—মর যাউঙ্গী বাপজী? জহর পিইকে?

বাবা চমকে উচ্চকণ্ঠে যেন চিৎকার করে উঠেছিলেন—না! নেহি! নেহি করনা ই কাম। খবরদার!

—তব্?

বাবা বলেছিলেন—মরতে তোর ডর হবে না?

—না।

—তবে তুই আমার সঙ্গে চলবি। পথে যদি হামলা হয়—আমি যদি মরি কি হেরে যাই—তবে সেইখানে তুই মরবি।

কি করে মরবে সে বাবা বলেন নি। তবে ছুরি একখানা তার কাছে ছিল। কিন্তু পথে যখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হামলাদারেরা হা-হা হল্লা করে তাদের দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন সন্ধ্যার মুখ, সব আবছা এবং তার মধ্যে বাবা যখন পড়লেন তখন ছুরি তার কাজে লাগে নি। রাস্তাটার একপাশে জঙ্গল, একপাশে খদ, সেই খদের মধ্যে সে পড়ে গিয়েছিল। নিজে লাফিয়েছিল না পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল, সে কথা স্মরণে নেই। পড়ে গিয়েছিল একটা ঝোপের উপর। নীচের পাথরে পড়লে চুর হয়ে যেত। তবে লাফিয়ে সে পড়েনি—এ কথা সে মনে করতে পারে। মায়ের বলা গল্প সেই আতঙ্কের মধ্যেও তার কানের পাশে যেন গ্রামোফোন রেকর্ডের মত বেজে চলেছিল।

মা তার কত গল্পই বলেছিলেন রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে!

একটা গল্প সেই মুহূর্তে তার মনে পড়েছিল। অথবা মায়ের কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হচ্ছিল আর সে কানে যেন শুনছিল। চোখেও বোধ হয় দেখছিল।

এই মাইথন ড্যামের কিনারায় বসে ছবিটা যেন সে আজও চোখে দেখছে। কাবুল-কান্দাহারের শাহ আবদালীর লুঠেরা সওয়ারেরা যখন লাহোরের কেল্লা দখল করে বসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল লুঠের জন্য, তখনও পাঞ্জাবের লোকেরা সাবধান হতে সময় পায় নি। পালায় নি ঘর-দোর ছেড়ে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে দুর্গম স্থানে। সবে শলা-পরামর্শ চলছে। শর্মাশাস্ত্রীদের এক শাখা লাহোর থেকে পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে একটা গ্রামে বাস করত। তারা নিশ্চিন্তই ছিল—দিল্লীর পথ থেকে দূরে। আবদালী যাবে দিল্লী। যত জলদি যাবে, ততই তার সুবিধে। গাজীউদ্দিন উজীরের সঙ্গে তার বুঝাপড়া। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় খবর এল, বিশ কোশ দূরে এক শহরে হানা দিয়েছে রোহিলারা। রোহিলখণ্ড থেকে আবদালীর সঙ্গে জুটতে চলেছে তারা। পথে লুঠতে লুঠতে চলেছে।

বিয়াস চোখে যেন দেখতে পাচ্ছে—মশাল জ্বলছে। হল্লা উঠছে। ঘরে আগুন লাগছে। তার সামনে তরঙ্গ-হিল্লোলিত বিরাট লেকটা যেন সন্ধ্যার আবছায়ার সঙ্গে মিশে অতীত কালের সেই পটভূমির সৃষ্টি করেছে।

মাইথনের পশ্চিম দিকে দূরে কলোনির মধ্যে ইলেকট্রিক আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। সন্ধ্যার

আকাশে কুমারডুবি চাঁচমগমার ফায়ার-ব্রিক্‌সের কারখানাগুলোর চিমনির মাথায় আগুনের আর ধোঁয়ার হল্কা উঠছে। সামনে উত্তর দিকে বরাকরে ডুপাশের সবুজ পাহাড়গুলো কালো হয়ে আসছে। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে আলোর ছটা—টুকরো টুকরো আলো ; আর উঠছে বনের ভিতরের গ্রামগুলির মাথায় ঘরে ঘরে জ্বালা উনানের ধোঁয়া। এ অঞ্চলে কয়লার কারবার। কাঁচা কয়লার ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে আকাশে। বাঁ দিকে কোলিয়ারি অঞ্চলে স্তূপীকৃত কাঁচা কয়লা পুড়িয়ে সফ্‌ট্ কোক তৈরী হচ্ছে—তার ধোঁয়া উঠছে। ভার্টিকাল বয়লারের মাথায় আগুনের শিখা। মনে হচ্ছে ১৭৫৭-৫৮ সালের পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে আবদালী রোহিলাদের আগুন জ্বলছে—গ্রাম পুড়ছে, ধোঁয়া উঠছে। পিছনে মাইথন ড্যামের মসৃণ পিচ-ঢালা পথ, পথের ডুপাশে সুন্দর শৌখীন ডুম-লাগানো সারি সারি আলো রেলিং—এসবের দিকে তাকালে স্বপ্ন ভেঙে যায় নিশ্চয়, কিন্তু সেদিকে সে তাকায় নি। তবে হাইড্রোলিকের প্রণালী-মুখে লেকের জল টারবাইন ঘুরিয়ে কল্লোল গর্জন তুলে,বরাকরের খাত বেয়ে ছুটছে, তার শব্দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বর্বর উল্লাসের হো-হো আর আর্তনাদের হা-হা মেশানো শব্দের পটভূমি। সে যেন দেখতে পাচ্ছে —ওই সামনের আবছায়ার মধ্যে শর্মাশাস্ত্রীর বাড়ি। পালাবার আয়োজন হচ্ছে গ্রাম জুড়ে। শর্মাগৃহকর্তা তলোয়ার হাতে ঘুরছে উঠোনে। কি করবে। সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার কন্যা —তারই মত অবিকল তার রূপ। হয়তো তার থেকেও দীপ্ত। কারণ, তার দেহে তো সবুজ বাংলার কালো রূপের ছোঁয়াচ আছে। বাপ বলছে—ভগবান, বলো কি করব ?

কন্যা বলছে—আমাকে তুমি কাটো, বাবা। আমার রক্ত পবিত্র থাকতে থাকতে আমাদের উঠান ভিজুক। ভগবান খুশী হবেন। পিতৃপুরুষ আশীর্বাদ করবেন—তোমাকে আমাকে !

ও-কথা ওই দিন ওই রাত্রি ভিন্ন বলা ওই কন্যার পক্ষেও সম্ভবপর ছিল না।

হল্লা উঠল গ্রাম-প্রান্তে। হুঁশিয়ার ! হুঁশিয়ার ! এসে গেছে !

শব্দ উঠেছে ঘোড়ার খুরের। হা-হা হুঙ্কার উঠছে।

দরজার গোড়ায় হল্লা উঠল।—এই বাড়ি। এই বাড়িতে আছে—সেই আশ্চর্য মেয়ে। এই বাড়ি।

বাপ দাঁড়ালো ঘুরে। সে রুখবে। মেয়ে পড়ল লাফ দিয়ে কুয়োতে। বাপ কি ভেবে নিজেও এসে লাফ দিল কুয়োতে। তলোয়ারখানা নীচের দিকে মুখ করে ধরেছিল শক্ত হাতে। যদি লাফ দিয়ে পড়েও বেঁচে থাকে মেয়ে ! তার পিছনে ঝাঁপ দিল মেয়ের মা, ঝাঁপ দিল বেটার বউ। লড়াই দিয়ে জখম হয়ে পড়ে গেল ছেলে।

সেই ছেলে বেঁচেছিল।

গাঁওয়ে গাঁওয়ে গীত গেয়ে বেড়াতো পাঞ্জাবের ভিক্ষুক গায়ক।

সে-ও সেদিন ঠিক এইভাবেই পড়েছিল খদের মধ্যে। বাপজী তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপ দিতে পারেন নি।

তার আগেই গুলি এসে বুকে লেগেছিল তাঁর। সে খদে পড়েছিল। তারপর সবে তার জ্ঞান হচ্ছে তখন।

এই রঙ এই চুল চোখে দেখে সর্দার হরদয়াল আর তার বেটা সবিস্ময়ে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন সেই খদের মধ্যে—অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ? ক্রীশ্চান ?

সে বলেছিল—না, আমি হিন্দু।

—হিন্দু ?

সর্দার হরদয়াল তাকে উঠিয়ে নিয়ে বলেছিলেন—চলো বেটী। উঠো।

সে আর্তস্বরে প্রশ্ন করেছিল। কাঁহা ?

চলো। হিন্দোস্থান। থোড়া দূর গেলেই মিলবে।

হরদয়ালের প্রৌঢ় সর্বহারা ছেলে বলেছিলেন—আমাকে দাও। তুমি বইতে পারবে না।

সর্দার বলেছিলেন—আরে, সফেদ ফুলের মত এই মেয়ে—ওজন তার কতটুকু। চলো বেটী।

সর্দারের ছেলে ছিল আজাদ হিন্দ্ দলের সিপাহী। সবে মাসকতক সে দেশে ফিরেছিল। সে চলেছিল নিঃশব্দে। তার দুই ছেলে গেছে, স্ত্রীকে নিজে হাতে কেটে এসেছে। কথা তার যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল। রাত্রিটা এসে, ভোরের সময় একখানা পুড়ে যাওয়া গ্রামের প্রান্তে একখানা পোড়ো ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। একটু পরই এসেছিল শিকারী জন্তুর মত চারজন।

* * *

—হ্যাঁ, এ তো ঠিক আপনি। এখানে এমন করে চুপচাপ বসে ?

একখানা জিপ এসে সশব্দে থেমে গিয়েছিল। জিপের শব্দে তার একাগ্রতা ভঙ্গ হয় নি, কিন্তু কথায় হল। সে মুখ ফেরালে। কণ্ঠস্বরে চেনার আভাস জেগেছিল, কিন্তু তন্ময়তার জন্য যেন অনেক দূরের ডাকের ক্ষীণ আবেদনের মতই স্পষ্ট হয় নি, প্রত্যক্ষভাবে তাকে স্পর্শ করে নি।

ডাকছিলেন তাকে মাইথনেরই একজন এঞ্জিনীয়ার ; দিব্যেন্দুরই বন্ধু। জীবন মিত্তির। কাজে কোথায় বেরিয়েছিলেন। সম্ভবত আণ্ডারগ্রাউণ্ড পাওয়ার হাউস থেকে আসছেন। ওই পাওয়ার হাউসেই তার দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল দিব্যেন্দুর সঙ্গে।

মিত্তির বললে—ওপাশের বাঁকটা ঘুরেই ড্যামের মুখে জিপটা আসতেই দেখি রেলিংয়ে চিবুক রেখে কে বসে। ইলেকট্রিকের আলো মাথায় পড়েছে। গালের একপাশে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, মিস ভট্টাচারিয়া ছাড়া আর কেউ নয় এ। এ রঙ, চুল, একজনেরই আছে এখানে। এবং এই শুভ্র পরিচ্ছদ-রুচি।

বিপাশা বললে—হ্যাঁ, আমার সৃষ্টিকর্তা আমার সর্বাঙ্গে একটা ছাপ মেরে দিয়েছেন বটে। চুলগুলো তার ধ্বজা। এ দেশের সবার চোখ আগে ওইখানেই পড়ে।

—আপনি রাগ করলেন না কি ? আমি কিন্তু—

হেসে বিপাশা বললে—না। আমার রাগ আমার চুল চোখ রঙের মত উগ্র। তাতে আপনি অন্তত জ্বালা অনুভব করতেন। রাগ করিনি তবে এখানে বসে বসে ওই কথাই ভাবছিলাম কিনা ! আমার জ্ঞান হওয়া অবধি—মায়ের কাছে, বাবার কাছে, জানাচেনা অচেনা লোকের কাছে—এত বার শুনেছি এই কথা ! এবং এতবার এর জন্যে বিপদে পড়লাম, আবার উদ্ধারও পেলাম, আবার তাই হল নূতন বিপদ—সে কি বলব আপনাকে। পাকিস্তান থেকে আসবার পথে বাবা মারা

গেলেন, আমি ঝাঁপ দিয়েছিলাম একটা খদে—সেখানে কিভাবে একটা ঝোপে পড়ে বেঁচেছিলাম। সর্দার হরদয়াল সিং আর তাঁর ছেলে আমাকে দেখে মরা ভেবেও এই এরই জন্যে আমার কাছে এসে দেখেছিলেন। চোখ মেলে তাকাচ্ছি দেখে প্রশ্ন করেছিলেন। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান? ক্রীশ্চান? ওঃ!

একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—সর্দার হরদয়াল অমৃতসরে এক বাঙালী ফ্লাইং অফিসারের হাতে বাঙালী বলে সঁপে দিলেন—তা সে ভদ্রলোক বিশ্বাসই করবেন না যে এই রঙ, এই চুল, এই চোখ বাঙালীর হয়। যাই হোক, তিনি আমাকে সেইদিন তাঁর প্লেনে দিল্লী আনতে পারলেন না। আমাকে পৌঁছে দিলেন রেফিউজি উইমেন ক্যাম্পে। সেখানেও সেই বিস্ময়। তখন আমার জ্বর, কলেরা ভ্যাকসিন নিয়েছি, তার উপর ওই উঁচু থেকে ঝোপের উপর পড়ে বেঁচেছি কিন্তু সর্বাঙ্গে ব্যথা যন্ত্রণা। ক্যাম্পের একপাশে খান তিনেক কম্বল নিয়ে পড়ে আছি। প্রায় বেহুঁশ। সেই সময় এক খাণ্ডারনী মেয়ে এসে চেঁচাতে লাগল, ই কৌন হ্যায়? এই—এই—! এই লৌণ্ডি! এই!

অনেক কষ্টে চোখ মেলে চাইলাম, বললাম—আমি কিরিস্তান নই।

মেয়েটা গর্জে উঠল—তবে তুই মুসলমানী।

বললাম—না। আমি হিন্দু।

সে বলে—কথনও না। হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলে। ইচ্ছে বলে তখন কিছু ছিল না। শুধু মনে এল একটা দারুণ আতঙ্ক। শুধু কাঁদতে লাগলাম।

মিত্তির বললেন—ওঃ, সত্যিই সে এক ভীষণ অবস্থা। বাচ্চা মেয়ে আপনি তখন—

—বারো বছর বয়স।

মিত্তির বললেন—আপনি কি এখানে বসে থাকবেন এখন?

—কি করব? ভাবি একটু জীবনের কথা।

—না। উঠুন। চলুন জিপে করে আপনাকে পাঙ্কেত পৌঁছে দি। আমি জানি মিস ভট্টাচারিয়া দিব্যেন্দুর উদ্দেশ্যহীন হয়ে ডুব মারার কথা। আপনার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাও জানি। আপনি এই লেকের ধারে বসে থাকবেন একা চুপ করে—এটা ঠিক হবে না। আমার অনুরোধ, আপনি ফিরে চলুন।

একটু হাসলে বিপাশা। তারপর হেসে বললে—আপনার ভয় হচ্ছে?

—বলতে পারেন। এবং যুক্তি অনুসারে নেহাৎ অমূলকও নয়।

—নাঃ, আমি মরতে যাব না সহজে। অন্তত দুঃখে মরতে যাব না। ভয়েও যাব না। শোকেও না।

—তা হোক। উঠুন। আপনার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেও বলছি—মানুষের বিচিত্র খেয়াল তো! যদি এখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে ডুব মেরে বরাকর নামক নদকুমারের কুমারহৃদয় তুলবার খেয়াল হয়, কে বলতে পারে? একটু হাসলেন মিঃ মিত্তির। অর্থপূর্ণ হাসি!

বেদনা-মিশ্রিত একটি স্মিত হাসি একবার বিপাশার মুখে ফুটে উঠল। বললে—আপনি তো অনেক জানেন দেখছি! চলুন। জিপে সে এবার উঠে বসল। সত্যিই রাত্রি বেশ হয়েছে।

পাহাড়ঘেরা মাইথনের বুকের আলোগুলি শরতের অমাবস্যার রাত্রির আকাশের নক্ষত্রের মত দেখাচ্ছে। তাকে পাঞ্চেতে ফিরতে হবে। মিশনের প্রধানা মাদার গ্রাহাম—বড় খিট্‌খিটে মানুষ। এমনিই তাঁর সঙ্গে বনাবস্তি নেই। তিনি কিছুতেই মনে করতে পারেন না, বা, রাখেন না যে, সে তাঁদের কেউ নয়।

মাদার গ্রাহাম আজও মনে ভাবছেন যে, সরকারী এই বৃত্তির অধ্যায় শেষ করে এ মেয়ে নিশ্চয় তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। এবং তিনিও ভাবতে পারেন না যে, এমনই যার সর্বাঙ্গে ইওরোপের সম্পর্কের চিহ্ন বিদ্যমান—হোক না সে সম্পর্ক-সূত্র সুদীর্ঘকাল অতীত পর্যন্ত দীর্ঘ তবুও এ মেয়েকে ক্রাইস্টের প্রবর্তিত ধর্মরাজ্যের প্রজা হতেই হবে। এ যে রক্তের দেয় রাজকর!

জীপটা ছুটে চলল। মিত্রের পাশে বসে পুরনো কথার জের টেনে সে বলল—যে কথা বলছিলাম—সেই রেফিউজি ক্যাম্পের মেয়েটা একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলে। আমি অসহায়। বুঝতে পারিনে কি করব! সে যে কি ভীষণ এবং জটিল অবস্থা সে, আপনি ভাবতে পারবেন না।

মিত্তির স্টিয়ারিংট ধরে সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। অন্ধকার ঘন হয়েছে, তার মধ্যে ইলেকট্রিক আলোয় পিচঢালা পথ চলে গেছে। পথে লোকজন বড় নেই। ভয় হঠাৎ পাশের অন্ধকার থেকে কোন অর্ধনগ্ন ছেলে ছুটে এসে পড়বে পথের উপর। অথবা কোন মদ্যপ্রমত্ত ব্যক্তি, এসে পড়বে টলতে টলতে। মিত্তির বললে—অনুমান নিশ্চয় করতে পারি।

—না, পারেন না। শুনুন। এই হৈ-চৈ-এর মধ্যে একসময় এলেন একজন সুবেশা প্রৌঢ়া। সব খোঁজ করে গেলেন। মিষ্টি কথা বলে গেলেন। কিছু ফল নিয়ে এসেছিলেন—ফল দিয়ে গেলেন। এক দয়াবতী মহিলা। একটা ব্যাজ রয়েছে বুকে। তিনি আমার কাছে দাঁড়ালেন। ঝগড়া মেটাবার জন্য কত মিষ্টি কথা বললেন। কিন্তু সেই খাণ্ডারনী অটল। কিছুতে শুনবে না। অবশেষে সেই দয়াবতী বললেন—আচ্ছা আচ্ছা, ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। আমাকে বললেন—ওঠ বেটি, চলো তুমি, আমার সঙ্গে চলো। আমি তোমাকে আমাদের দলের সঙ্গে দিল্লী পৌঁছে দেব। আমি বাঁচলাম। আমাকে বললেন—তুমি বলবে, আমি তোমার আপনজন। হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে। আমি চললাম। বেরিয়ে এলাম; তাঁর সঙ্গে গাড়ি ছিল—টাঙ্গা অবশ্য। নিয়ে গিয়ে তুললেন একটা বাড়িতে। সেখানে আরও প্রায় তিরিশজন মেয়ে আঠারো বিশ পনের ষোল; সবাই দেখতে সুন্দরী। বাড়ির দরজায় পাহারা। সেটাও একটা ক্যাম্প। কিন্তু কিসের জানেন? নারী বেচা-কেনার কারবারীর। ওই প্রৌঢ়া তার একজন সংগ্রহকারী। মালিক কয়েকজন আছেন শিখ সর্দার, হিন্দুশ্রেষ্ঠ, একজন তিলকধারীও ছিলেন। ক্রেতা—বড় বড় শহরের ব্রথেল পরিচালকরা। শুধু তারাই নয়, জমিদার আছে, রাজাও আছে, আবার বর্ধিষ্ণু চাষীও আছে।

মিত্তির বলে উঠল—মাই গড্! বলেন কি?

পৃথিবীর বুকে অরণ্য কেটে নগর বসিয়েছে মানুষ, রাস্তায় আলো জেলেছে, কিন্তু তারই মধ্যে আশ্চর্যভাবে অরণ্যের অন্ধকার মিশে রয়েছে এবং চলছে অরণ্যের খেলা। শ্বাপদে শ্বাপদে লড়াই চলছে, বাঘে হুঙ্কার দিচ্ছে, ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে হরিণের উপর, রক্ত পান করছে। আবার হায়েনা

ঘুরছে, চুরি করে আনছে বাঘিনীর শাবক। শেয়ালে ধরছে খরগোস। হয়তো বা মানুষের সমাজের অরণ্যের কারবার আরও হিংস্র, আরও কুটিল, আরও জটিল। মানুষ ফাঁদ পেতে জানোয়ার ধরে। মানুষও ধরে। এবং এ ফাঁদে মানুষ যারা ধরা পড়ে, তাদের নিষ্কৃতি থাকে না। সে—স্লেভ মার্কেট, মিস্টার মিত্তির, এ ভেরী বিগ স্লেভ মার্কেট! সেখানে রাজার মুকুট শেঠের পাগড়ী, ফেল্ট হ্যাট, কোট-প্যাণ্ট-টাই—সব দেখেছি, ক্রেতা। দে কেম ইন বিগ কার উইথ আর্মর্ড গার্ডস সিটিং বাই দি সাইড অফ্ ড্রাইভারস্। আমার ভাগ্যবলে আমি তার মধ্যে থেকে উদ্ধার পেলাম। আমাকে কিনেছিল দিল্লীর এক শেঠ। নিজের জন্য নয়। দিল্লীর জি. বি. রোডে ছিল মস্ত বাড়ি। সেখানে থাকত এই দেহপণ্যারা। জন দশেক মেয়ে কিনে সে ফিরছিল। আসছিল ট্রাকে বোঝাই করে নিয়ে। সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল ক'জন প্রৌঢ়া—ক'জন যোয়ান। সব থেকে আশ্চর্য কি জানেন—যে খাণ্ডারনী ক্যাম্পে আমাকে মুসলমানী ক্রীশ্চান বলে হৈ-চৈ করেছিল, সে-ও ছিল তার মধ্যে। যোয়ানদের সঙ্গে ছোরা। সেগুলো আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছিল মধ্যে মধ্যে। আমি খানিকটা বুঝছিলাম, খানিকটা বুঝছিলাম না। সন্দেহটা দৃঢ় হল খাণ্ডারনীকে দেখে। কিন্তু কি করব? অন্য যারা, বয়স বেশী, কিন্তু আমার থেকে ভীতু। তারা হতভম্ব হয়ে বসে ছিল। একদিন একরাত্রি পর তখন সন্ধ্যে হবে হবে—হল কি জানেন, একটা রেলওয়ে ক্রসিংয়ে গাড়িটা আটকে গেল। শুধু আমাদের ট্রাক নয়—সারিবন্দি গাড়ি। জিপ আর ট্রাক। তার সঙ্গে রয়েল গাড়ি। লোকে চলেছে দিল্লী। দিল্লীতে তাদের—হামারা সরকার। সেই সরকারের কাছে চলেছে। খেতে দাও, থাকবার জায়গা দাও, হামারা এই-এই লোক হারিয়েছে, খুঁজে দাও!

আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল আমার মায়ের কথা। মরণা হ্যায় তো লড়না হ্যায়। মারণা হ্যায় তব মরণা হ্যায়। সাহস পেয়ে গেলাম সামনে খান দুই জীপ দেখে আর একখানা গাড়িতে একজন মিশনারী ইংরেজকে দেখে। ওদের ইস্কুলে ছেলেবেলায় পড়েছি। আমি হঠাৎ উঠে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম ট্রাক থেকে, ছুটে গিয়ে মিশনারী ফাদারকে বললাম—সেভ মি ফাদার—সেভ মি! প্রাণ ফাটিয়ে চিৎকার করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সবার দৃষ্টি পড়ল আমার দিকে। জীপ থেকে মিলিটারী অফিসার লাফিয়ে পড়ল। লোকজন হল্লা করে উঠল। কি হল? আমি বললাম—আমাদের ওরা কিনে নিয়ে যাচ্ছে? কে? কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন মিলিটারী অফিসার। কোমরের পিস্তলটা হাতে উঠল। এরপর আর জানি নে। আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান হয়ে দেখলাম, আমি মিশনারী সাহেবের গাড়িতে। আমার এই রং চুল দেখে আমাকে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ক্রীশ্চান জেনে তুলে নিয়েছেন। কথাও বলেছিলাম আমি ইংরিজীতে। সুতরাং—

একটু হেসে বিপাশা বললে—ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার হয়ে গেল। হিন্দুর মেয়ে পড়লাম ক্রীশ্চানের হাতে।

মিত্তির জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু তাদের কি হল?

—শুনেছিলাম, মেয়েগুলো সেই খাণ্ডারনী-সমেত ধরা পড়েছিল—কিন্তু পুরুষগুলো লাফ মেরে

পড়ে সেই হাজার হাজার রেফুউজীর দলে কোথায় যে মিশে গেল ধরতে পারে নি। ড্রাইভার ধরা পড়েছিল। তাদের খুঁজে বের করার উপায় ছিল না, কারণ ফটক খুলতেই চলমান জনস্রোত বাঁধভাঙা জলের বেগে ঠেলা মেরে এগুতে আরম্ভ করেছিল।

মাইথন থেকে পাঞ্চেতের পথে খুদিয়া নদীর পুল। সেই পুলের উপর উঠল জীপ।

মিত্তির বললেন—ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন, আপনার জীবন তাই।

চুপ করে গেল বিপাশা। যেন অকস্মাৎ থেমে গেল। খুদিয়াপুলের উপর উঠে অকস্মাৎ তার দিবোন্দুকে মনে পড়ে গেছে।

দুদিকে আশে পাশে কোলিয়ারি। বয়লারের ফানেলের আগুনের শিখা নাচছে। ওদিকে ফায়ার-ব্রিক্স কারখানায় সারি সারি চিমনির মাথায় আগুন দেখা যাচ্ছে। কোলিয়ারির গিয়ার হেডের তারের দড়া নামার শব্দ, বয়লারের গুম্ গুম্ শব্দ, স্টীম বেরুনোর শব্দ, কুলীদের গান—শোনা যাচ্ছে।

মিত্তির কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে প্রশ্ন করলে—ক্রীশ্চান তো হন নি আপনি?

—না। ছেলেবেলা থেকে মা আমার মনে হিন্দুধর্মকে পাকা করে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। আজ ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি নেই আমার। কিন্তু সংস্কার আমার মনের গভীরে রয়েই গেছে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—তার জন্যে আমি লজ্জিত নই কোনদিন।

আবার একটু চুপ করে থেকে বললে—জীবনের নীতিধর্মকে, তার সঙ্গে সংস্কৃতিকে যারা ধর্মের উর্ধ্বে তুলতে পারে তারা নমস্য, মহতো মহীয়ান। যাঁরা ধর্মকে ধ'রে ধর্মগত নীতি মেনে সংস্কৃতিবান—তাঁরা মহৎ। কিন্তু ধর্মকে পায়ে দলে নীতি-বিচারকেই আবর্জনার মত ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে যারা সংস্কৃতির বড়াই করে, তারা যে পায়ে ধর্মকে দলতে চায়—তারই পথের ধুলো উড়িয়ে গায়ে-মাথায় মেখে রসাতলে দেয় সংস্কৃতিকে। নাইট-ক্লাবে তার সাক্ষাৎ পরিচয় মিলবে। এমনতরো অনেক সংস্কৃতির আসর আছে শহরে শহরে। আমি সাধারণ একটি মেয়ে—যে ধর্মে মানুষ হয়েছি তাকে ছাড়তে আমি পারব কেন? চাইনেও ছাড়তে।

মিত্তির এর কোন উত্তর দিলেন না। জানতে চাইলেন এর পরের কথা। বললেন—কিন্তু এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে বেগ পেতে হয় নি?

—হয়েছিল। সেও অনেক কথা। কিন্তু—

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে বিপাশা—মনটা কেমন ক্লান্ত হয়ে গেছে অকস্মাৎ। বলব—অন্য কোন দিন। আজ থাক।

এর পর জীপ চলল তার শব্দ তুলে। এরা নিস্তব্ধ। পাঁচেতের আলো দেখা যাচ্ছে এবার। পাঁচেত আজও শেষ হয় নি। কাজ চলছে। এই রাত্রেও মেশিনের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বিপাশাই বললে—'উপনয়ন' নৃত্যনাট্যে আপনি সেজেছিলেন বরাকর। না?

—হ্যাঁ। দিবোন্দু নিজে দামোদর।

—খুদিয়া?

—মেয়েটির নাম ভুলে গেছি। কলকাতা থেকে এসেছিল।

হেসে বিপাশা বললে—খুদিয়া ব্রিজটায় উঠে মনে পড়ে গেল। খুদিয়া ব্যঙ্গ করে বলছে দামোদরকে—আ, তুরা আর বুলিস না গো, কথা আর বুলিস না। সাদাবরণ গঙ্গার লেগে পরাণ তোর উথালি-পাথালি করছে! আঃ, হায় মরদ! যত মর্দানী আমাদের কাছে। সে তো পুঁছলেও না। আঃ।

—আপনাকে একটু ব্যঙ্গ করতে চেয়েছিল দিবেন্দু। আমাকে বলেছিল।

আবার চুপ করে গেল বিপাশা। মাইল দেড়েক রাস্তার মধ্যে আর সে কথা বললে না। জীপটা এসে দাঁড়াল পাঞ্চেতে জেনানা মিশনের কাছে। জীপ থেকে নেমে বিপাশা বললে—আচ্ছা। আপনাকে ধন্যবাদ।

—দাঁড়ান, এক মিনিট!

দাড়াল বিপাশা।

মিত্তির বললে—দিবেন্দুর খোঁজ করতে আমি চেষ্টা করছি। আমি ঠিক এখনও বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার!

শুধু সংক্ষিপ্ত একটি কথা—ধন্যবাদ।—বলেই চলে গেল বিপাশা। অত্যন্ত দ্রুত পদে। বোধ করি চোখে তার জল এসেছে।

চার

আপনাকে প্রণাম, মাদার গ্রাহাম বিকেল বিকেল বেলা চলে গেছেন। একটা জরুরী টেলিগ্রাম এসেছিল।

বিপাশার কোয়ার্টার্স আলাদা। এখানকার মিশনের শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে। ছোট একখানি ঘর এবং রান্নাঘর বাথরুমযুক্ত কোয়ার্টার। একটি আদিবাসী মেয়েই তার কাজ-কর্ম করে। রান্নাও সেই-ই করে, কিন্তু কুকারে হয়। একটি ছাগল আছে, আর আছে একটি বেড়াল। ছাগলটা ওই আদিবাসী মেয়েটির—চুড়কির। বেড়াল নিজেই এসে স্থান করে নিয়েছে বিপাশার কোল ঘেঁষে বসে। আর একজন আছে, তার খাদ্য এখান থেকেই মেলে কিন্তু দরজার বাইরে তার স্থান। সে একটা কুকুর।

বাড়িতে এসেই সে চুড়কির কাছে মাদার গ্রাহামের খবর শুনে নিশ্চিন্ত মনে মুখ হাত ধুয়ে এসে জানলার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। ওঃ, একটা তিক্ত বাদানুবাদের অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন ভগবান। ডাকলে—চুড়কি!

—হুঁ, যাই। চায়ের জলটা চড়ায়েছি। চা ভিঁজায়ে আসছি!

সামনে ওই দূরে দামোদরের গর্ভ। বালি-ঢাকা পাথুরে নদীগর্ভ। সারি সারি আশোর ছটায় দেখা যাচ্ছে। মধ্যে পাথরের স্তর উঠে জেগে রয়েছে বাঁধের মত।

ভাঙরে—ভাঙরে—ভাঙরে—
বুক দিয়ে ঠেলে ভাঙরে—
নখে দাঁতে কামড়ে ছিঁড়ে রক্তে অঙ্গ রাঙরে—

দামোদর নদের মুখের গান। রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের ছায়া আছে, কিন্তু সে ছায়াকে এরা বর্বর সুর আর প্রকাশভঙ্গি দিয়ে চাপা দিয়েছে। এর সঙ্গে মাদল বাজতো, মুখেও বোল বলত, ধিত্তাং তাং, ধিত্তাং তাং—তাংরে।

ওই 'উপনয়ন' গীতি-নাট্যের গান। রচনা করেছিল দিব্যেন্দু। এবং অভিনয় করেছিল অনেক বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে। দিব্যেন্দু নিজেই নিয়েছিল দামোদরের ভূমিকা। এই অভিনয়ের আসরেই দিব্যেন্দুর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল। অর্থাৎ দিল্লীর কনস্টিটিউশন হাউসে প্রথম সেই সাক্ষাতের কথা-কাটাকাটির পর। সে সবে এখানে তখন মাত্র দিন তিনেক এসেছে। জেনানা মিশনেও ওরা নিমন্ত্রণ করেছিল, সেও একখানা কার্ড পেয়েছিল। বেশ লেগেছিল। কিন্তু শেষটায় মনে মনে হেসেছিল। একটু লজ্জাও হয়তো হয়েছিল। কারণ, ওর মধ্যে গঙ্গার ভূমিকাটিতে যেন সে নিজেকে দেখতে পেয়েছিল! যে মেয়েটি গঙ্গা সেজেছিল তাকে সাজানো হয়েছিল তার রূপ অনুকরণ করে এবং দিল্লীতে কনস্টিটিউশন হাউসে তার সঙ্গে দিব্যেন্দুর যে বিরূপতার মধ্যে পরিচয় হয়েছিল, তার কিছু কথাবার্তাও এসে পড়েছিল। অথচ, সাধারণের কাছে এতে কোন কিছু অসঙ্গতি আছে বলে মনে হয় নি। হিমাচল-দুহিতা গঙ্গা, গলিত তুষারবর্ণা, তার চুল স্বর্ণাভ, চোখ স্বর্ণাভ। এবং বর্বর অরণ্য পর্বত যা হিমালয়ের কাছে ভ্রাতা, তার সন্তান দামোদরকে সে গ্রাহ্য করবে কেন? দিব্যেন্দু ভুলতে পারে নি কনস্টিটিউশন হাউসের সেই কথাগুলি।

চুড়কি এসে দাঁড়াল দু'কাপ চা নিয়ে। একটা কাপ নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—সাহেব? সি কুথা?

ভ্রূ-কুঁচকে তাকালে বিপাশা—কে সাহেব?

—কেনে সেই সাহেব—মাইথনের সাহেব? যার সঙ্গে দেখা হয় তুমার, নিত্যি—

—তাকে কোথায় দেখলি তুই? বিপাশা বুঝলে সে দিব্যেন্দুর কথা বলছে।

—কেনে, তুমাকে গাড়িতে করে নিয়ে এলো যি! নামলে দুজনাতে।

—না। সে মিত্তির সাহেব। চলে গেছেন তিনি।

—সি? সি সাহেব কুথা গেল? লোকে বুলছে কুথা গেল্‌ছে। ফিরে নাই?

—না!

—কবে আসবে?

—জানি না! হয়তো আসবে না।

—আসবে না? চুড়কি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু হেসে বিপাশা বললে—না এলে কি করব?

—কেনে? চুলের মুঠো ধরে নিয়ে আসবে! তুমি ছাড়বে কেনে?

—তা তো আনব। কিন্তু পাব কোথায় ?

—কেনে ! তার বাড়িকে যাও।

—তুই বুঝি যেতিস ?

—হুঁ। ঠিকই যেতম। বলতম—তুমার লাজ নাহি হে ? তুমি ঘুরুর ঘুরুর করলে—ছিঁচকার মতুন। আমি ডাকলাম ভালমানুষ ভেবে। ভালবাসা দিলম। তুমি পালায়ে এলে ? কেনে তা আসবে ? ছাড়ব কেনে হে তুমাকে ? বলে তার চুলের মুঠা খামুচে ধরতম। পঞ্চায়েৎ ডাকতম।

—তাই যাব। কিন্তু আজ আর আমার জন্যে ময়দা মাখিস নে। রুটি খাব না।

—কি খাবে ?

—ভেবে দেখব পরে চুড়কি। তুই যা এখন। তুই এখন যা। তোর রান্না তো আছে। খাবি তো তুই।

—যাচ্ছি আমি। তুমি বৈঠে বৈঠে ভাব—আর ফোঁসর ফোঁসর কর।

বলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বলল—নোকেরা সব হাসছে।

—হাসুক !

চুড়কি চলে গেল। চুড়কির নোকেরা অর্থে মিশনের শিক্ষয়িত্রী যারা তারা। তা তারা হাসুক।

তবে চুড়কি যা বলেছে, তা খুব অযুক্তির কথা নয়। দিব্যেন্দুর একটা খোঁজ করবে না ? তাকে খুঁজে অন্তত এই প্রশ্নটা করবে না—তুমি মানুষ না পশু ?

এই প্রশ্ন সে ওই নৃত্যনাট্যের দিন অবশ্য অন্যভাবে করেছিল। সে দেখা করতে এসেছিল অভিনয়ের পর অন্য একটা তাগিদে। তাগিদে নয়—একটা বিশেষ কৌতূহলের প্রেরণায়। দামোদর নদের ভূমিকায় সে যে মেকআপ করেছিল—সেই মেকআপে তাকে যেন খুব চেনা মনে হয়েছিল। খুব চেনা। কিন্তু তা সে ঠিক ঠাওর করতে পারে নি। কিন্তু বলতেও পারে নি। সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল। তখন অবশ্য মেকআপ তুলে ফেলে দিব্যেন্দুই হয়েছে। তাই সে-কথা বাদ দিয়ে ওই প্রশ্নই করেছিল। তার মধ্যে এই অভিযোগ ছিল না—সরস স্মৃতি-জড়িত একটু সলজ্জতা ছিল। নৃত্যনাট্যের অভিনয়ের পর বলেছিল—আপনি কে বলুন তো ?

দিব্যেন্দু হেসে বলেছিল—অভিনয়ে দেখলেন তো, বন্য-বর্বর। কৃষ্ণাঙ্গ।

সে বলেছিল—আপনি খুব সেন্টিমেণ্টাল এবং স্মৃতিও খুব তীক্ষ্ণ।

—বন্যেরা তা হয় একটু।

—না, দামোদরের কথা বলছিনে। আপনার কথা বলছি।

—হ্যাঁ, তাও বটে। তা না হলে এঞ্জিনীয়ার হয়ে নৃত্যনাট্য রচনা করি ! না পাঞ্জাবে গিয়ে বাজী রেখে নদীতে ঝাঁপ খাই !—বলেই একটু হেসে বোধ করি প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্যেই বলেছিল—তারপর, কেমন লাগলো বলুন ?

—অভিনয়—রচনা ?

—তীর যখন লক্ষ্যভেদ করেছে—অর্থাৎ হিট দি মার্ক হয়েছে তখন ফুলমার্ক পাবেন আপনি।

আরম্ভটা চমৎকার হয়েছে। পুরাণ-টুরাণ খুব পড়েছেন, না? সুন্দর। এবং সুচতুরও বটে।

সত্যই সুন্দর। এবং সুচতুর এই অর্থে যে, দিল্লীতে তার সঙ্গে যা যা ঘটেছিল—তাই নিশ্চয় তার মনের মধ্যে বেশ একটা ক্ষোভ এবং বেদনার সঙ্গে ফুটে উঠতে চেয়েছিল—ফুটে উঠেওছে, কিন্তু সেটা যে তার জীবনের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তা কোনক্রমেই বোঝা যায় না। আরম্ভ করেছিল মাইক্রোফোন মারফৎ একটি ভূমিকা পাঠ করে।

পুরাণের কাল। তখনও ভারতবর্ষের বুকে গঙ্গার ত্রিতাপহারিণী সলিলধারা প্রবাহিণীরূপে প্রবাহিত হয় নি। আজকের গাঙ্গেয় উপত্যকা—সেই বিস্তীর্ণ ভূমি—হরিদ্বার প্রয়াগক্ষেত্র বারাণসী তীর্থ-মহিমায় মহিমান্বিত হয় নি, হিমাচল বক্ষকণার উর্বরতায় উর্বর হয় নি, এই বিস্তীর্ণ ভূমিতল তখন আকাশ-প্রসাদ-ভিক্ষু; বঙ্গোপসাগর থেকে হরিচন্দনের মত কোমল মৃত্তিকাময়ী অঞ্চলের তখনও জন্ম হয়নি। তখন একদা উদ্ধত সগরসন্তানেরা মহাতপস্বী কপিল মুনির ক্রোধানলে ভস্ম হলেন। তাদের ভস্মরাশি সলিল-সিঞ্চন-বঞ্চিত মৃত্তিকার উপর নিয়ে এল মরুভূমির ধূসরতা। গঙ্গার উপকূল থেকে দূরে যাবেন আপনারা লালমাটি আর কাঁকরের দেশে—পাবেন আজও তার রুক্ষতা ও অনুর্বর ধূসরতার সামান্য কিছু পরিচয়। এই ভস্মরাশির মধ্যে লক্ষ সগর সন্তানদের প্রেতাত্মা সমাধিস্থ। ভগীরথ গেলেন তপস্যা করতে। তপস্যায় তুষ্ট করলেন। ব্রহ্মা কমণ্ডলুতে বিষ্ণু পাদোদ্ভূতা গঙ্গা মাতৃগর্ভে অপরূপা কন্যার মত ধ্যানমগ্না। ব্রহ্মা কন্যার ধ্যানভঙ্গ করে বললেন—মা, তোমার ভূমিষ্ঠ হবার লগ্ন সমাগত। তুমি ভূমিষ্ঠ হও; অবতীর্ণ হও নগাধিরাজের অঙ্গনে, তাঁর মহাশক্তিরূপিণী কন্যা উমারই মত সমান সমাদরে গৃহীত হও; সেখান থেকে অবতীর্ণ হও হরিদ্বারে, ধূর্জটি তোমাকে জটাজালে ধারণ করবেন, তাঁর শিরোমণির সমাদর গৌরব গ্রহণ করে অবতার্ণ হও ভূমিতলে—বসুমতী ধন্য হোন, ভারতবর্ষ পুণ্য মহিমায় মহিমান্বিত হোক, শ্যামলা হোক, কোমলা হোক, তোমার শীতল শীকরস্নিগ্ধ সমীরণাকাঙ্ক্ষিণী হয়ে স্বয়ং কমলা শ্যামাঞ্চলখানি বিছিয়ে তাঁর সোনার অঙ্গ এলায়িত করে সুখাসীনা হোন; স্বয়ং উমা গৌরী অন্নপূর্ণারূপিণী হয়ে তাঁর অন্নশালার প্রতিষ্ঠা করুন। লক্ষ সগর সন্তানের অভিশপ্ত আত্মা অভিশাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গগামী হোক। তাদের সঙ্গে কোটি কোটি পতিত আত্মার উদ্ধার হোক। পাপী পাপমুক্ত হোক, তাপী তাপমুক্ত হোক তোমার স্নিগ্ধ সলিল অবগাহনে। ভূমি শস্যশালিনী হোক—নিরন্ন ক্ষুধার্ত অন্নে তুষ্ট হোক তৃপ্ত হোক, সাধু তপস্বীর সাধনা পুষ্ট হোক—তপস্যা সিদ্ধ হোক তোমার তটপ্রান্তে।

ব্রহ্মার বাক্য শেষ হতেই কমণ্ডলু থেকে আবির্ভূতা হলেন এক অপরূপা কন্যা। শুভ্র তাঁর দেহবর্ণ, স্নিগ্ধশীতল তাঁর স্পর্শ, নীলাভ তাঁর চক্ষুতারকা, আয়ত নেত্র দুটি যেন সদ্য জলোত্থিত শ্বেত পদ্মকোরক, মূর্তিমতী পবিত্রতা—মূর্তিমতী নিখিল-শুভ্র-সৌন্দর্য। কন্যা বললেন—কিন্তু এ কি দুষ্কর কর্ম দিলে আমাকে পিতামহ? এত পাপ, এত তাপ আমি বুকে ধরব কি করে?

পিতামহ বললেন—মা, যে বিষ্ণু থেকে তোমার উদ্ভব—আর যে ধূর্জটি তোমাকে মস্তকে ধারণ করবেন—তাঁরা হরিহর মূর্তিতে মিলিত হয়ে মহাসমুদ্রের মধ্যে তোমার জন্য আদিকাল থেকে

অবস্থান করছেন ; মহাপাল আর মহাকাল—তোমার পিতা এবং স্বামী উভয়ে গ্রহণ করবেন এ ভার।

দেবী সুরধুনী এবার নামতে লাগলেন পুণ্যলোক পথে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য অন্য দেবমহিমাও বিগলিত হয়ে কুমার কুমারীর মূর্তি ধরে নামতে লাগল। ব্রহ্মার মহিমা অপরূপ কুমার রূপে ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করে নামতে লাগল। দেবরাজ ইন্দ্রমহিমা মহাবীর্যবান কুমার সিন্ধুরূপে অবতীর্ণ হলেন। ওদিকে নামলেন—শোণভদ্র। সঙ্গে সঙ্গে নামলেন চন্দ্রভাগা, শতদ্রু। নামলেন দেবকুমারীকুল। যমুনা, সরস্বতী, বিপাশা, ইরাবতী, সরযূ। বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হবেন গঙ্গা দেবীর নির্দেশে। কেউ যাবেন পশ্চিমে আর্য ঋষিদের তপস্যা ক্ষেত্রে। কেউ যাবেন পশ্চিম সমুদ্রে। কেউ যাবেন পূর্বে।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আচ্ছন্ন করে এলেন পুণ্য পুষ্কর মেঘ, তিনি মেঘপুষ্প অর্থাৎ বারিধারা বর্ষণ করতে লাগলেন—লাজবর্ষণের মত। হিমাচল শীর্ষে সে সলিলধারা শুভ্র তুষারে পরিণত হল। তারই উপর পাদক্ষেপ করলেন তুষারবরণী শুভ্রকেশিনী গঙ্গা। হিমাচল বললেন—ধন্যোঽহং! সেখানে পূজা সমাদর গ্রহণ করে, ধূর্জটি-জটাজালে নৃত্যলীলা শেষ করে দেবী নামলেন ভূমিতলে ভূতলে, ভারতবক্ষে হরদ্বার—হরিদ্বারে। সমগ্র ভারত-ভুবন শঙ্খধ্বনিতে কাঁসর ঘণ্টা বাদ্যে উৎসবময়ী সরসা হয়ে উঠল। ভয় নাই, আর ভয় নাই। সঙ্গীতধ্বনি উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা উত্তোলিত হয়েছিল।

শুভ্রবর্ণা শুভ্রকেশিনী গঙ্গাকে মধ্যে রেখে বন্দনা করছিল পুরনারীরা শঙ্করাচার্য রচিত গঙ্গাস্তোত্রে—

দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে—
ত্রিভুবনতারিণী তরলতরঙ্গে—
শঙ্করমৌলিনিবাসিনী বিমলে—
মমমতিরাস্তাং তব পদকমলে।
হরিপাদপদ্ম বিহারিণী গঙ্গে—
হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে—
খণ্ডিত গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে॥

দেবী গঙ্গা স্মিতহাস্যে শস্যশীর্ষ দিলেন গৃহস্থ বধূকন্যাদের। সাধু-সন্ন্যাসীদের দিলেন সিদ্ধি, বণিকদের দিলেন কড়ি শঙ্খ। এবং জয়ধ্বনির মধ্যে দিয়ে পুষ্কর সলিলরাশির স্রোতে মকরবাহনে আরোহণ করে অগ্রসর হলেন।

তাঁরা চলে যেতেই এল আরও কয়েকটি বিচিত্র মূর্তি।

এরা পুষ্কর মেঘ ছাড়া অন্য মেঘ।—সম্বর্ত-আবর্ত-দ্রোণ। কেউ পিঙ্গলবর্ণ, কেউ কর্দমলিপ্ত কুটিল কৃষ্ণবর্ণ, কারও বর্ণ ধূসর ধূলিবর্ণ। হাতে ধ্বজা। কারও ধ্বজায় বজ্র এবং ঝড়, কারও ধ্বজায় বন্যা ও মড়ক, কারও ধ্বজায় অনাবৃষ্টি এবং মড়ক। এরা সকলেই বিক্ষুব্ধ অপমানিত।

গঙ্গাবতরণে তাদের মেঘপুষ্প বর্ষণের অধিকার দেওয়া হয় নি। তারা অপাংক্তেয় ?

সঙ্গে সঙ্গে এলেন সমুদ্র-মন্থনে অমৃতবঞ্চিত মৃত অসুরদের আত্মা—যাঁরা নিহত হয়েছিলেন দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে এবং বাসুকি নাগের বিষে।

কেন আমরা আজ আমাদের জীবন-মহিমাকে পাঠাতে পাব না মর্ত্যভূমে ? আর্যাবর্ত বলে ?

সঙ্গে সঙ্গে এলেন হিমাচল-মহিমা-বিদ্বেষী পর্বতেরা। কেন হিমাচল-শিখরেই অবতীর্ণ হল দেব-মহিমা ? কেন আমরা বঞ্চিত হলাম ?

এর পর এলেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য।

বললেন—উত্তম কথা। দৈত্য শিষ্যবৃন্দ, তোমরা দৈত্য হয়েও বাহুবলে স্বর্গ অধিকার করেছিলে একদা। আজ মৃত্যুলোক থেকে পাঠাও তোমাদের মহিমাকে কুমার-কুমারী রূপে। পর্বতবৃন্দ, তোমরা তাদের ধারণ কর, গ্রহণ কর পালক-পিতা রূপে। যেমন হিমাচল আজ গঙ্গার জনক, সিন্ধুর জনক, ব্রহ্মপুত্রের জনক। তেমনি তোমরা হও এই বীর্যবানদের পিতা। আর মহাশক্তিশালী মেঘবৃন্দ, তোমরা এদের বহন কর—তোমাদের শক্তিতে এদের শক্তিমান কর। থর্ব করো গঙ্গার মহিমা। বন্যায় বিধ্বস্ত করে দাও গঙ্গা পুণ্যমহিমান্বিত অঞ্চল।

বেজে উঠল কাড়া-নাকড়া করতাল-শিঙা। গুরু গুরু গুরু—ঝন ঝন—বিচিত্র ঐকতান বাদন।

শুরু হল গান—'ত্রিপুরাসুত নন্দন আমি প্রলয়শূলধর—

ভীষণ রুদ্র সঙ্গে যুঝিব আমি রে ভয়ঙ্কর—

শুক্রাচার্য হাত তুলে বললেন—আমি দিনু বর, আর নাম—দামোদর। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লয়ে, অমিত বিক্রমে তুই বিচরণ কর।

ডোরাসে সকলে গেয়ে উঠল—স্বাগত সুস্বাগত—অমিত বীর্যধর—

জয় দামোদর—জয় দামোদর, জয় দামোদর !

আবার এল এক কুমার—সে এসে বললে—আমি বরা-কর।

তার হাতে গদা !

এমনি করে এল, কুমার-কুমারী। অনার্য সব। তেমনি বন্য বেশভূষা। মাথায় কোঁকড়া চুল, মুখে দাড়ি-গোঁফ। গলায় শঙ্খের মালা। পশুচর্মে বক্ষদেশ ঢাকা। পরনে রক্তাম্বর। মেয়েদেরও তাই।

বোকারো এল, কোনার এল। ওদিকে আবির্ভূত হল দারুকেশ্বর।

কুমারীরা এল—কেউ বললে—আমি বড়কি গড়িয়া—

তুফান তুলে পড়ব আমি ভুঁয়ে ঝারিয়া—

ও দামোদর, ও দামোদোর, মোর তুফানে ধর !

একসঙ্গে এরপর দুজন—একজন বললে—হম যমুনিয়া—

হম গোয়াই—

দামোদরের চরণ ধোয়াই—

চলো-চলো হে দামোদর আর সহে না তর।

ওদিকে বরাকরের কাছে এল ইসরি আর খুদিয়া। দুই কন্যা। হাতে মালা নিয়ে গাইলে—হালকা পাতলা মেয়ে খুদিয়া নাচলে লাফিয়ে লাফিয়ে এঁকে বেঁকে! পাথর ডিঙিয়ে পাথরে সুড়ঙ্গ কেটে সে আসছে যে। আশ্চর্য তরঙ্গময়ী খুদিয়া। লাস্যময়ী।

আমি খুদিয়া—আমি খুদিয়া—আমি খুদিয়া—
হরিণীর লাফে নাচিয়া নাচিয়া—
সাপিনীর ছাঁদে আঁকিয়া বাঁকিয়া—
ভাঙনের তালে ভেঙে ভেঙে চলি কে ধরিবি মোরে ধর।

বরাকর এসে তার হাত ধরে বললে—আমি ব-রা-ক-র।

এই ভাবে শিলাই মিলল দারুকেশ্বরের সঙ্গে। ওদিকে চলল কাঁসাই কংসাবতী একা। চলো সকলে মিলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব, খর্ব করব বিষ্ণুহৃহিতা শুভ্রবরণী গঙ্গার উপর। সমুদ্রসঙ্গম মুখে, তাকে বন্দিনী করব। আমাদের জল গিয়ে পড়বে সমুদ্রে। গঙ্গা হারিয়ে যাবে আমাদের মধ্যে। এদিকে বন্যায় জলোচ্ছ্বাসে ধ্বংস আনব গঙ্গামহিমান্বিত দেশে। চলো-চলো-চলো। বরাকর খুদিয়া ইসরি—মিলিত হয়ে এসে দামোদরকে শ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে তার সঙ্গে নিজের শক্তি মিলিয়ে দিলে।

দামোদর ভেরী বাজিয়ে হাঁক দিয়ে বললে—

বরণ-গরবী দেবতার মেয়ে শোনো গো শোনো
কালোদের দেশে এসেছ এবার নয়নেতে
কালো কাজল টানো।

গঙ্গাকে দেখা গেল—পটভূমির গা ঘেঁষে চলে যাচ্ছেন প্রবাহিনী হয়ে, মুখে একটু স্মিতহাসি। শঙ্খ-ঘণ্টা বাজছে তার গতির সঙ্গে। পাশে পাশে চলেছে লক্ষ্মীর নৌকা।

খুদিয়া খিল খিল করে হেসে উঠল, হায়রে কালো মরদ, তোর কাঙালীপনা ওই সাদা মেয়ের কাছে।

দামোদর সেকথা গ্রাহ্য না করে বললে—তা হলে এই হল যুদ্ধ-ঘোষণা।

গান আরম্ভ হল—ভাঙরে-ভাঙরে!

ভেরী কাড়া-নাকাড়া শিঙা বাজতে লাগল। নাচতে লাগল তারা। নেপথ্যে কলরব উঠল মানুষের।

আবার সূত্রধার নেপথ্য থেকে বললে—অবাধ ধ্বংসলীলা চলল এই দামোদরের। গ্রাম-নগর শস্যক্ষেত্র সরোবর উদ্যান গ্রাস করে চলল সে অবাধে—চলল ওই শ্বেতবরণীকে সমুদ্রসঙ্গমের আগেই ধরবে, বন্দিনী করবে। ওদিক থেকে দারুকেশ্বর এল, নাম পাল্টে রূপনারায়ণ হয়ে। এল কাঁসাই হলদি হয়ে। বসুমতীর বক্ষ ক্ষত বিক্ষত হল। লক্ষ্মীর আসনকে বিধ্বস্ত করলে। মানুষ কম্পিত হল দামোদরের ত্রাসে। কিন্তু আশ্চর্য! ওই যে শ্বেতবরণী দেবনন্দিনী—তার মহিমা খর্ব হল না। ওরা মিলিত ভাবে মোহনার মুখে সংগ্রাম দিলে। প্রচণ্ড সংগ্রাম। কিন্তু ভাগীরথীর জলধারার মহিমা ম্লান হল না। কেউ পূজা করলে না দামোদরকে। কত হাজার

বছর গেল—তবু না হল জয়, না হল সন্ধি—না পেলে দামোদর গৌরব।

তারপর সে অন্তরে অন্তরে তপস্যা শুরু করেছিল। অসুরত্ব-মোচনের।

গঙ্গা বলেছিলেন—তুমি ত্রিপুরাসুরের আত্মজ। ত্রিপুরারি শিবেরই বর্জিত দৈত্যভাবের অংশ সে। তাই তিনি ছাড়া কেউ তাকে বধ করতে পারেনি। বর্জন করে এস তোমার দৈত্যভাব। তোমাকে গ্রহণ করব, সন্ধি করব তখন। তুমি পূজা পাবে, যখন কল্যাণব্রতী হয়ে আসবে তখন।

তাই অন্তরে অন্তরে চলছিল তপস্যা।

সেই তপস্যায় কলিযুগে এই বিংশ শতাব্দীতে দেবলোক থেকে বৃহস্পতির শিষ্য বিশ্বকর্মার আত্মজেরা দেববিদ্যা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁরা এসে বললেন—উপবীত ধারণ করে আত্মত্যাগে কল্যাণের ব্রত গ্রহণ কর দামোদর, বরাকর। তাহলেই দেবত্ব অর্জিত হবে।

দামোদর বললে—দাও আমাদের উপবীত। দীক্ষা দাও।

আয়োজন চলল উপবীত ও দীক্ষ গ্রহণের। বিরাট আয়োজন।

নৃত্যনাট্যে যজ্ঞকুণ্ড জেলে উপবীত ধারণ করলে দামোদর, বরাকর।

পুরোহিত বললেন—বন্ধন—সংযমবন্ধনকে স্বীকার কর।

—করলাম।

—নিজের জীবন—তোমার জলরাশি চারিদিকে মানুষের সেবায়, লক্ষ্মীর সেবায় প্রবাহিত কর।

—করলাম।

—তুমি দ্বিজ হলে। এই তোমার নবজন্ম। তুমি দেবত্ব লাভ কর।

গঙ্গা এলেন। দূরে আবির্ভূতা হলেন, বললেন—প্রসন্ন হয়েছি। হে কৃষ্ণবর্ণ রুদ্র, তুমি শুভ্রবর্ণ দেবতা থেকেও মহিমান্বিত হও। দ্বিজত্ব অর্জন করেছ, কল্যাণব্রত গ্রহণ করেছ—এস, অবসান হোক সকল দ্বন্দ্বের। চল—প্রসন্ন মিলিত ছন্দে মিলিত হব সমুদ্ররূপী হরিহরের সঙ্গে।

অবশ্যই এর পরে গান ছিল। কিন্তু এক বিস্ময়ে অভিভূত বিপাশা সে গান মন দিয়ে শোনেনি।

প্রথম বিস্ময় তার হয়েছিল দামোদরকে দেখে। দাড়ি-গোঁফ বাবরী চুলে দামোদরকে দেখে মনে হয়েছিল—এ কে? এ কে? বড় চেনা মনে হচ্ছে যেন? মনে করতে পারে নি। দিব্যেন্দু বলে সন্দেহই হয়নি। তার কথা প্রথমটায় তো মনে হবার কথা নয়। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের উদ্যোগে এই নৃত্যনাট্য, এ তাদের খানিকটা প্রচারধর্মী। গ্রন্থনের কল্পনাটি ভাল লেগেছিল। পুরাণের সঙ্গে এ যুগের ছোট-বড়ত্বের দ্বন্দ্ব মিশিয়ে আবরণটি ওদের নিপুণ মেক-আপের মতই মনটিকে রসমগ্ন করে দিয়েছিল। যতক্ষণ না দামোদর গঙ্গাকে বলেছিল—

বরণগরবী দেবতার মেয়ে শোন গো শোন—
কালোর দেশেতে এসেছ এবার নয়নেতে
কালো কাজল টানো—
কাজল দীঘিতে ডুব দিয়ে নাও—
সোনালী চুলের বরণ ফিরাও—

কালো চুলে হয়ে ভুবনমোহিনী মাল্য আনো।
শোনো গো শোনো।
আনিতে হবে—মানিতে হবে—
হাসিতে হবে বসিতে হবে—ভালোবাসিতে হবে—
দেবতা গরব কালো এ মাটিতে মিশিয়া যাবে—
জানো গো জানো।

এই গান শুনে একটু যেন চমকে উঠেছিল মনে মনে। ঠিক তো সেই কথা। বর্ণগরবিনী! কালোর প্রেমে তোমাকে পড়তে হবে। একবার মনে হয়েছিল—সে হলেও হতে পারে। হ্যাঁ, সে-ই তো এই ডি-ভি-সির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এঞ্জিনীয়ার! চ্যাটার্জি। নৃত্যনাট্যকার, পরিচালক এবং দামোদর—দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি!

শেষ দৃশ্যে উপবীত ধারণ করে দ্বিজত্ব অর্জনের সময় দামোদর এসেছিল দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে। তখন আর চিনতে বাকা থাকে নি! এই তো।

সেই কারণেই সে নিজেই দেখা করেছিল তার সঙ্গে।

প্রথমেই বলেছিল—চিনতে পারেন?

দিব্যেন্দু বলেছিল—নিশ্চয়। আপনি তো আমার নৃত্যনাট্যের গঙ্গার মতই অবিস্মরণীয়া!

তারপরই সে বলেছিল—কিন্তু আপনি এখানে? কি করে এলেন?

হেসে সে বলেছিল—আমি পাঞ্চেতে এসেছি। মিশনারীদের জেনানা মিশনে ট্রেনিং নিতে। ট্রাইব্যাল ডেভলপমেণ্টের বৃত্তি পেয়েছি একটা। মাত্র পাচদিন এসেছি অবশ্য।

তারপর হয়েছিল তাদের ইঙ্গিতে বাক্যালাপ।

পাঞ্চেতে ফিরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম হয় নি। ওই দিল্লী কনস্টিট্যুশন হাউস এবং মাইথনের রঙ্গমঞ্চের নৃত্যনাট্যের বিচিত্র যোগাযোগের কথা মনে করে কৌতুক অনুভব করেছিল। অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ এবং ঈষৎ সলজ্জ কৌতুক। ভাল লেগেছিল। একসময় মনে হয়েছিল—বড্ড ভুল হয়ে গেল। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে হত। সেটা দামোদর যখন বিপুল তরঙ্গ নিয়ে সমুদ্র মোহনার কাছে গিয়ে গঙ্গার জলে আছাড় দিয়ে পড়ল, তখন সে উঠে এসে মুঠো বাঁধা হাত তুলে দেখিয়ে হুঙ্কার দিল না কেন—এই পেয়েছি শুভ্রবর্ণ গরবিনী, এই পেয়েছি তোমার কুমারী হৃদয়। বলে হাত মেলে ধরতেই দেখা যেত মুঠোর মধ্যে হৃদয় নয়—যা এসেছে সে কাদা আর বালি। সমুদ্রের মোহনায় গঙ্গার গর্ভ—তাতে বিপাশার গর্ভের মত তো নুড়ি নেই!

পরের দিন বিকেল বেলাতেই দিব্যেন্দু এসেছিল। সে অনুমান করেছিল—আসবে সে, ঠিক আসবে। তার ভুল হয় নি। সে বসেছিল—পাঞ্চেতের ড্যামের যে দিকে লেক হবার কথা সেই দিকে। ড্যামের কাজ তখনও চলছিল। একটা পাথরের উপর বসে সে ওই আধখানা তৈরা ড্যামের দিকে চেয়ে ভাবছিল গত রাত্রের নৃত্যনাট্যের কথা। উপবীতধারী দামোদর বরাকর খুদিয়া যমুনিয়া—এরা চলে যাবার পর এই ড্যামের ডামিগুলি না দেখালে ভাল হত যেন। ঠিক এই সময়েই একটা স্কুটারের ফট্‌ফট্ শব্দ শুনে ফিরে দেখেছিল—দিব্যেন্দু! সে হেসেছিল। আসবে

সে জানত। লোকটিকে ভাল লেগেছে। গুণী মানুষ। দামোদর ওর সাজা উচিত হয়নি! ও মুষলধারী নয়। কিন্তু না-দেখার বা না-গ্রাহ্য করার ভাণ করেই সে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল। এবং প্রত্যাশা যা করছিল, তাই ঘটেছিল অক্ষরে-অক্ষরে।

এক সময় শুনেছিল তার কণ্ঠস্বর—দূর থেকে দেখেই চিনেছি, আপনি।

—রঙ আর চুল দেখে?

—ঠিক তাই।

—কাজললতা কোথায় পাওয়া যায় এবং কাজল দীঘি কোথায় আছে বলুন তো?

ঠিক সামনের পাথরে তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বসে বলেছিল—অনুমতি না নিয়েই কিন্তু বসলাম সামনা-সামনি।

—বসুন। আপনি আসবেন আমি জানতাম। তাই ওটা সামনে রেখেই বসেছি—আপনার জন্য ওটা রেখে।

—আপনি জানতেন?

—জানতাম।

—আমারই ভুল। কালো আলোর পিছনে ছোটে, আর আলো কালোর পিছনে ছোটে। মনে মনে ডাকেও। এটা জগতের নিয়ম! সুতরাং—

যেন চমকে উঠে বিপাশা তার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়েছিল।

—কেন, অন্যায় বললাম নাকি? দেখুন আপনার এমন স্ফটিকশুভ্র রূপ, পিছনে কালো ছায়া নিঃশব্দে পায়ের তলায় পড়ে আছে। সূর্য পশ্চিম দিগন্তে, পূর্ব দিগন্ত থেকে অন্ধকার এগিয়ে আসছে। আসছে নয়—ছুটছে ওই আলোর উৎসের দিকে।

—হুঁ। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল বিপাশা।

দিব্যেন্দু প্রশ্ন করেছিল—রাগ করলেন নাকি?

—না।

—তবে?

—আপনার মনখানিও প্রদীপের শিখার মত। স্ফটিকের প্রদীপে আলোর শিখা।

বাধা দিয়ে বিপাশা বলেছিল—এত কাব্য কেন করছেন। তার থেকে চার পয়সার একটা মোমবাতি বলুন না। মোম সাদাও বটে এবং আলোও জ্বলে।

—উঁহু। মোমবাতি বড় সোজা এবং অত্যন্ত নরম। আলোর দহনে নিজেই বেদনায় গলে। স্ফটিক শুভ্র এবং কঠিন। তা ছাড়া দাম ওর অত্যন্ত কম। আপনার মূল্য স্ফটিক থেকেও বেশী।

এবার সে হেসে ফেলেছিল। পরিতৃপ্ত প্রসন্ন হাসি।

দিব্যেন্দু বলেছিল—যা হোক এবার হাসলেন।

সে বলেছিল—আর না-হেসে উপায় আছে? এতেও যদি না হাসি—তবে দুনিয়ায় কাব্যই মিথ্যে হয়ে যাবে।

দিব্যেন্দু বলেছিল—এবার নিশ্চিন্ত হলাম। দিল্লীর ওই ঘটনাটার পর কতবার যে মনে হয়েছে

—বোধহয় অন্যায়টা আমার।

—উঁহু!

—কেন?

—তাহলে গঙ্গা-দামোদরের বিরোধটা শাদা-কালোর ঝগড়া দিয়ে ফোটাতে চাইতেন না। ওটা আপনার মনের মধ্যে সদাসর্বদাই ছিল—

—তা ছিল। কিন্তু বললাম তো, আলো ছোটে—কালো তার পিছনে ছোটে।

—হ্যাঁ। এবং কালো জানে না যে আলোও তার পিছনে ছুটছে।

—বলতাম। একবার বলেছি। কিন্তু যা তাকালেন আপনি!

—না। সে জন্যে তাকাই নি। এই কথাটিই আমাকে বলেছিলেন আর একজন। এবং আপনার সঙ্গে যেদিন দিল্লীতে ওই ঘটনা ঘটে—তার পরদিন। সকালেই গিয়েছিলাম আপনার কাছে ত্রুটি স্বীকার করতে। কারণ তলোয়ারকর এসে বিপাশায় আপনার সাঁতার কাটার এবং ডুব দিয়ে পাথর তোলার ছাপানো প্রমাণ নিয়ে যখন এলেন—তখন লজ্জা নিশ্চয় হল, খুব লজ্জা হল। আমার নিজের রূপ লজ্জা পেল। ছি! ছি! ছি!

—বুঝতে পারছি। ভাবলেন—ওই কালো সাঁওতালটা—

—এবার ঝগড়া হবে।

—বেশ, বেশ! বলব না। আপনি বলুন, সারা রাত্রি ভেবে—

—না। সেইদিন রাত্রেই তলোয়ারকরকে সঙ্গে করে গিয়েছিলাম আপনার ঘরে। আপনি তখন তালাবন্ধ করে বেরিয়ে গেছেন।

—সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। দেবকা বোসের 'কবি' হচ্ছিল। বইটা পড়া ছিল। 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো ক্যানে?' গানটা মনে পড়েছিল।

আবার হেসে ফেলেছিল বিপাশা। বলেছিল—কালো বলে তো আপনার নিদারুণ কমপ্লেক্স!

দিব্যেন্দু বলেছিল—তাই তো কালো ছায়া হয়ে আলোর সামনে পায়ের তলায় পড়ে থাকে। আলোর পিছনে ছোটে!

—হাঁ। ওই কথা সেই কথা। পরের দিন সকালেও গেলাম। শুনলাম আপনি দিল্লী ছেড়ে চলে গেছেন। মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। সেদিন আমার এক পরম হিতৈষীজন আমার মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হয়েছে বেটি! তোমায় এমন করে ভাবতে তো দেখি নে? আমি সব বললাম। তিনি বলেছিলেন ওই কথা। মা, কালোর শুভ্রতার দিকে, আলোর দিকে, অনুরাগ তো প্রকৃতির আবেগ। কালো ছোটে আলোর পিছনে, আলো ছোটে কালোর পিছনে। সে তোমাকে বলে গেছে কালোকে তোমাকে ভালোবাসতে হবে—সেটা আর অভিশাপ কিসের? কালো মানুষ তো রাম, কালো মানুষ তো কৃষ্ণ! একটু হেসে বলেছিলেন—বেচারা হয়তো উত্তপ্ত মস্তিষ্কে মনের কথাটাই বলে গেছে। কিন্তু মানুষ তো রূপই খোঁজে না মা, তার সঙ্গে মনও খোঁজে। তাই বাংলাদেশে বাউলরা বলে—খুঁজি আমি মনের মানুষ। হোক না কালো—হোক না গোরা।

—বাঃ! দিব্যেন্দু তারিফ করে বলেছিল—সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক! বাঙালী নিশ্চয়—যখন বাংলা দেশের বাউলের কথা বলেছেন।

—হ্যাঁ। বাঙালী সন্ন্যাসী।

—তিনিও কালো?

—হ্যাঁ। তা ছাড়া আজ আপনার ওই কথা শুনে, ওই ভাবে তাকানোর আরও একটা কারণ ছিল। কাল আপনাকে দামোদরের মেক-আপে দেখে প্রথম তো আপনি বলে ধারণাই করতে পারি নি। কিন্তু চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল, কোথায় দেখেছি যেন। আজ হঠাৎ তাঁর কথা মনে পড়তে মনে হল—আদলটা তাঁর মত হয়েছিল।

কালো এবং সন্ন্যাসী—দাড়ি গোঁফ চুল আছে, রক্তাম্বর পরেন—

—না রক্তাম্বর পরেন না। সাদা বহির্বাস পাঞ্জাবী। অদ্ভুত মানুষ, পণ্ডিত, উদার। আমাকে যা রক্ষা করেছিলেন।

—কি হয়েছিল?

—পাকিস্তান থেকে সেই পার্টিশনের দাঙ্গার সময় এলাম কোনরকমে—এক সর্দারজী, তিনি দেবতা—তার সঙ্গে জম্মু, সেখান থেকে অমৃতসর। পিতৃমাতৃহীন বারো বছরের মেয়ে—

সবিস্ময়ে দিব্যেন্দু বলে উঠল—আপনি তো বাঙালী।

—মা পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণের মেয়ে, বাবা বাঙালী ব্রাহ্মণ, লাহোরের কালীবাড়ির পূজারীর ছেলে বাবা, বাঙ্গালী!

একটু চুপ করে থেকে সে বলেছিল—সে দিনগুলোর কথা মনে হলেই রবীন্দ্রনাথের গানের একটি লাইন মনে পড়ে। 'নিবিড় তিমির নিশীথিনী'। শুধু অন্ধকার, আলো কোথাও নেই। দিনে সূর্য উঠেছে, তবু অন্ধকার। রাত্রে চাঁদ-তারা থাকতেও নিরন্ধ্র অন্ধকার। আর গ্রাম-নগর-বসতিও কিছু নেই। সব অরণ্য, বন। মানুষের মুখে জন্তুর চেহারা। ওঃ! আজ সে সব পার হয়ে এসেছি বলেই বলতে পারছি। জয়ী হলেই হয় অ্যাডভেঞ্চার—না হলে মানুষ বলে—থাক সে সব কথা!

সেইদিন সেই অপরাহ্ণে, গুনতিতে দিব্যেন্দুর সঙ্গে পরিচয়ের তৃতীয় দিনে, হ্যাঁ তৃতীয় দিন; প্রথম দিন কনস্টিট্যুশন হাউসে সন্ধ্যায়, দ্বিতীয় দিন গতকাল রাত্রে অভিনয়ের পর ওদের সাজঘরে, তার পরদিন তৃতীয় দিন ওই পাঞ্চেতে দামোদরের তটভূমে পাথরের উপর বসে জীবনের কথা বলাবলির মধ্যেই তারা পরস্পরের কাছে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল।

জীবনে দুঃখের কথা ব'লে ভিক্ষুকে করুণা লাভ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু দুঃখকে জয় ক'রে যে বিজয়িনী কি বিজয়ী, সে—সে কাহিনী বলে যায় আনন্দের সঙ্গে। বোধ করি এই আনন্দ মানুষকে একটু মুখর করে তোলে, অন্তত সব কথা বলার একটা ব্যগ্রতা তাকে আপনা থেকে বলায়। তাই তার জীবনের দুঃখ জয় এবং দুঃখ থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার কাহিনী বলতে শুরু ক'রে বলেই গিয়েছিল। একবারও প্রশ্ন জাগে নি কি মনে করছে শ্রোতা!

অবশ্য দিব্যেন্দু মনে কিছুই করে নি। আজ দিব্যেন্দুর বিচিত্র অন্তর্ধানে সংশয় অনেক জাগছে,

তবু মনে হচ্ছে—না—না, সে প্রতারক নয়। কোন বিপদ, কোন কিছু এমন হয়েছে যার জন্যে হয়তো—!

চোখ তার জলে ভরে এল। ঝাপসা হয়ে গেছে পাঞ্চেতের ইলেকট্রিক আলোর সারি। ওঃ! দিব্যেন্দু! দিব্যেন্দু সেদিন তার কাছে বসেছিল তানপুরা নিয়ে সঙ্গতকারের মত—সে গেয়েছিল তার দুঃখ-জয়ের জীবন-সঙ্গীত। তার তানপুরাতে তান উঠেছিল সমবেদনার খাদের গভীর 'সা'-এর সুর তুলে। সে বলে যাচ্ছিল। দিব্যেন্দু শুনছিল। মধ্যে মধ্যে নিম্ন-গভীর স্বরে বলেছিল—হে ঈশ্বর! অথবা—ওঃ! অথবা—মাই গড্!

মায়ের কথা সে যখন বলেছিল—মা বলেছিলেন—মরণা নেহি হ্যায় বেটি। মরণা হ্যায় তো লড়না হ্যায়। মরণাকে আগে মারনা হ্যায়।

সে বলেছিল—অদ্ভুত!

বাবার মৃত্যুর কথা শুনে বলেছিল—ওঃ, মানুষ কি হিংস্র!

সর্দারজীর কথা শুনে বলেছিল—আ! —আচ্ছা—!

সর্দারজীর কথা—জীবনকে ধরম হ্যায় জিন্দিগী! জিন্দিগী হ্যায় সাচ্চা। লেকিন আনন্দমে জিন্দিগী জিন্দাবাদ! নইলে আজও পর্যন্ত দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ—জিতা রহো। আনন্দ রহো কেন?

সে বলেছিল—বাঃ বাঃ! এই তো!

সে তন্ময় হয়ে বলেই চলেছিল—মনে হয়েছিল দিব্যেন্দুকে আপনার জন।

* * *

সে বলেই চলেছিল—ক্রীশ্চান মিশনারী সাহেব এই রং আর চুলের জন্যেই বোধহয় ধরেই নিলেন আমার রক্তের মধ্যে আছে ক্রীশ্চিয়ানিটির বীজ; হিন্দু সমাজের মধ্যে যে রক্ত এবং জীবনবীজ বন্দী হয়ে থেকে বহু গ্লানি বহু নির্যাতন সহ্য করেছে—হয়তো বা অধোগতির পথে প্রায় অন্ধকারে ডুবতে চলেছে তাকে মুক্ত করতেই হবে। বাইবেল ইস্কুলে পড়তে হত। সেইজন্য কিছু কিছু জানতাম। তাই আমাকে ক্রীশ্চান করবার আয়োজন করতে লাগলেন।

আমি বিপদে পড়লাম। বারো বছর বয়স হয়েছে। ধর্মের জন্য দুঃখ সয়েছি। বাপ হারিয়েছি। মা আমার মনে পাকা ভিত গেঁথে গেছলেন—তার উপর স্ট্রাকচার উঠতে শুরু করেছে। আমার মনে হল—এ ভয়ানক বিপদ। আমি কাঁদতাম।—ম্যায় হিন্দু হুঁ। ক্রীশ্চান ন বনেগী! নেহি। নো-নো-নো! ওঁরা বুঝিয়ে যান। বিরাম নেই। দিন-রাত্রি। আজকাল ব্রেনওয়াশিং বলে একটা কথা উঠেছে। জানি নে সেটা কতদূর কি সত্যি। কিন্তু কথাটা শুনে মনে হয়—তাকেও বলা যায় ব্রেনওয়াশিং। সে যে আমার কি আত্মার যন্ত্রণা! মাকে রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখি, কাঁদি। তবে এটা বলব, হ্যাঁ, ওরা জবরদস্তি কিছু করে না। কিন্তু খেতে দিয়ে পরতে দিয়ে আশ্রয় দিয়ে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে ওরা অনুরোধ করে—আমি রাখতে পারিনে, সে কি যন্ত্রণা বলুন তো! এই সময়! বুঝলেন—কি ভাবে কার কাছে সংবাদ পেয়ে এই সন্ন্যাসী এলেন। একটি হিন্দু কন্যা—সে ক্রীশ্চান হতে চায় না শুনলাম। তাকে আপনারা ক্রীশ্চান করবেন কেন? আমার হাতে তাকে দিন। আমি তার ভার নেব!

মিশনের ফাদার বললেন—সে হয় না। অসম্ভব! আপনি কে? পরিচয় কি? এ দেশের লোক এ দেশের মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে বিক্রী করে—এদেশের লোকেই কেনে। আপনাকে বিশ্বাস করব কি করে?

তিনি বললেন—নিশ্চয় বলতে পারেন এ কথা। কিন্তু এ ধরনের বিপ্লবাত্মক দুর্যোগের মধ্যে পশুরা সুযোগ পায়। সব দেশেই পায়, কম আর বেশী। আপনাদের দেশের কথাও জানি, পড়েছি।

সে সব অনুরোধ বা কথা ওরা শুনবে কেন? শুনলে না। বললে—আপনাকে চলে যেতে বলছি আমি।

চলে গেলেন, কিন্তু পরের দিন আবার এলেন। সঙ্গে দিল্লীর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বাঙালী। পদস্থ লোক। তারা স্বামীজীকে চেনেন। হিন্দু অনাথদের জন্যে একটি আশ্রম করেছেন—ইস্কুল আছে। চলে সরকারী সাহায্যে। তিনি প্রতিষ্ঠাতা। আরও কয়েক জায়গায় আছে। তিনি যখন ক্রীশ্চান হ'তে অনিচ্ছুক এই হিন্দু মেয়েটিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন তখন ফাদারকে তাঁরা বললেন—ওঁরই হাতে তাকে দিতে। তাঁদের দেওয়া উচিত। না দিলে—। সরকারী কর্মচারী হিসেবেই তাঁরা বলছেন।

তখন কাজ হয়েছিল। উদ্ধার পেয়ে এসেছিলাম—তাঁর আশ্রমে। তিন বছর ছিলাম। ওখানেই বাংলা শিখেছিলাম। ছোট আশ্রম। একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির। অল্প কয়েকটি মেয়ে, সবগুলি অনাথা—কারুর চোখ নেই, কেউ খঞ্জ, এমনি। গুটি দুই যুবতীও ছিলেন। দুজনই স্বামী-পরিত্যক্তা। তাঁরাই কাজ-কর্ম করতেন। পাশে একটি ইস্কুল ছিল। বাঙালীর ছেলে-মেয়েরা পড়ত সেখানে; বাংলাভাষায় শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তিন বছর ওখানে পড়ে ভর্তি হয়েছিলাম মেয়েদের ইস্কুলে! রেফেউজী ছাত্রী হিসেবে বৃত্তি পেতাম। উনি বললেন—এবার বোর্ডিংয়ে যাও তুমি। এ আশ্রমে অনাথাদের আশ্রয় মেলে। কিন্তু তোমাকে সক্ষম হয়ে ক'রে খেতে হবে, দাঁড়াতে হবে। এ জায়গায় তেমন মন তৈরী হবে না। আশ্চর্য উদাসীন মানুষ, দিনরাতই কি ভাবেন। রাধাকৃষ্ণে খুব ভক্তি। বলতেন—এই তো প্রেম। এই প্রেমেই তো ভগবান বাঁধা পড়েন। ইংরেজরা বলে, লাভ ইজ গড্—আমরা বলি গড্ লিভস্ ইন লাভ। প্রেমে তাঁর বসতি। ওঃ, কি প্রেম বল তো! কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্ক, তাই কলঙ্ক মাথায় করে রাধা ধন্য। চোখ দিয়ে জল পড়ত।

দিব্যেন্দু বলেছিল—আশ্চর্য! ওয়াণ্ডারফুল!

—আর কি জানেন? গোঁড়ামি, অন্য ধর্মের নিন্দা তিনি কখনও করতেন না। কখনও না। একবার তখন আমি ইস্কুল শেষ ক'রে কলেজে ঢুকেছি। ওঁদেরই কলেজে। ওঁরই পরামর্শে। উনি নিজে গিয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। বোর্ডিং আলাদা বলেছিলেন—ওকে আপনাদের কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। অন্য কারণে। সে কারণ আর নেই। মানে বড় হয়েছে, এখন বোধ হয়েছে। এখন বুঝে যদি ক্রীশ্চিয়ানিটি ভাল লাগে—হবে। আমি নিশ্চয় বাধা দেব না। তবে আপনাদের কাছে লেখাপড়া শিখবে এটা আমার নিশ্চিত ধারণা এবং নিরাপদে থাকবে। তারপর আবার সেই অনুরোধ। কত উপদেশ। ভাল লাগত না। ওঁকে বলেছিলাম। কেন ওরা এমন করে বলুন তো? কেন ওরা ভাবে আমরা অন্ধকারে রয়েছি। উনি বলেছিলেন—মা, অনেকে অনেক ব্যাখ্যা করেন।

তার মধ্যে অনেক গূঢ় আবিষ্কার আছে। সেগুলো মন্দ, কুটিল। কিন্তু আমি জানি মা, একটা দিকের কথা অবশ্য, সেটা ওদের খুব আন্তরিক। মানুষকে নিজের ধর্মে এনে নিজের মতই উন্নত করতে চায়। তার কারণ কি জান? আমাদের অনেক তত্ত্ব ওরা বুঝতে পারে না। ধর, রাধাকৃষ্ণের প্রেম, ওরা বুঝতেই পারে না। ধর, আমরা বা আমার বাড়িতে এলেন একজন যুবা, আলাপ হল —তুমি আমার কন্যা, বাড়িতে আছ—সে এসে যে মুহূর্তে জানলে বা বুঝলে তোমার সঙ্গে তার বিবাহে সামাজিক বাধা আছে—তখনই সে তোমাকে বললে দিদি বা বোন। আমরা মা সম্পর্ক পাতাই, বোন দিদি সম্পর্ক পাতাই। ওরা তা করে না, কারণ প্রেম বিবাহ এ সব বিষয়ে ওদের সমাজের বাঁধন বল, পথ বল, অনেক শিথিল, অথবা প্রশস্ত।

একটু চুপ করে থেকে সে বলেছিল—ক'টা বাজল বলুন তো?

দিব্যেন্দু ঘাড় নেড়ে বলেছিল—বেশী না; সাড়ে সাতটা।

হেসে উঠেছিল বিপাশা—মোটে! অথচ গোটা জীবনের গল্পটাই বলা হয়ে গেল!

—ওই তো মানুষের আর্ট। বাস্তব পৃথিবীতে যা এক হাজার বছরে ঘটে—মানুষ সেটা ছেঁকে নিয়ে, চেঁছে-ছুলে পালিশ করে এক হাজার লাইনে—কি একশো লাইনে বলে দেয়। অথচ শেখাতে হয় না—মন আপনি যা মনে রাখবার মনে রাখে, বাকীটা ফেলে দেয়।

—দামোদরের উৎপত্তি থেকে এ পর্যন্ত ক'হাজার বছর? দেড় ঘণ্টায় শেষ করলেন কাল—

—তা হিসেব করি নি। ওখানে হিসেবের চেয়ে ফরমাস বড়। দেড় ঘণ্টাই বেশী হয়েছে। কর্তারা বলছিলেন।

—শেষটায় ড্যামের ডামিগুলোও ফরমাস?

—নিশ্চয়। না হলে খরচ-খরচা দেবে কেন ডি-ভি-সি?

হঠাৎ গত রাত্রের কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল। বলেছিল—কাল রাত্রে একটা কথা ভেবেছিলাম, ঠিক করে রেখেছিলাম দেখা হলে বলব!

—বলুন।

—সাজেশন আমার।

—বলুন, বলুন। বিনয় করছেন বেশী। কিন্তু আপনাকে ওটা সাজে না।

—কেন সাদা রঙ বলে?

—আমার মানতে আপত্তি নেই। বলুন।

—ওই দামোদরের আর গঙ্গার যেখানে সত্য বিরোধ, ওই মোহনার জায়গায়—ওইখানে—।

—হ্যাঁ, বলুন।

—চলুন, উঠুন—বলতে বলতে যাই। রাত্রি হয়ে গেছে। আটটা হলেই মাদার খোঁজ করবে। ওদিকে নতুন ঝি—সে বসে থাকবে। ভাববে হয়তো। সে তো জানে না আমি পাকিস্তান পার হয়ে এসেছি দাঙ্গার সময়। চলুন।

চলতে চলতে বলেছিল—মানে, নাচটা ভাল হয়েছে। এরা সদলবলে তরঙ্গ নিয়ে গঙ্গার উপর আছড়ে পড়েছে, গঙ্গা ঠিক আপনার গতিতে নেচে চলেছে, হাত দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে আর এরা সরে

আসছে—বেশ হয়েছে। তবে—বলব ? অন্ধকারে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল কিন্তু দেখতে পায় নি। দিব্যেন্দুও ওর ঠোঁটের চাপা হাসি দেখতে পায় নি। তবুও বলেছিল—এত যখন ভনিতা করছেন—তখন কথাটি নিশ্চয় ঝাঁঝালো।

—না। তা নয়। একটু ওখানে গম্ভীরভাবে হাস্যরস আনতে পারতেন। লোকে একটু উপভোগ করত।

—যথা ?

—ধরুন, একসময় দামোদর খুব পাঁয়তারা কষে ঝাঁপ দিত, বলত—এইবার ঝাঁপ দিনু জলে—পণ মোর—। সেই কবিতার লাইন বসিয়ে দিতে পারতেন। বলে ঝাঁপ দিয়ে উঠে আসত ডান হাতখানা মুঠো করে তুলে। এবং সদম্ভে বলতে পারত—এই আনিয়াছি ওরে শুভ্রবরণী কন্যা, তোর কুমারী-হৃদয়খানি তুলে—এই বাহুবলে। বলে হাতখানি খুলত আর তা থেকে ঝরে পড়ত কালো কিষ্টনি কাদা—কারণ, মোহনার মুখে তো নুড়ি পাওয়া যায় না। সবই পলি আর কাদা। তারপর নিজেই বলত—এ কি ? খুদিয়া বলতে পারে—হায় কালো মরদ ও শুধুই কাদা।

হো-হো করে হেসে দিব্যেন্দু বলেছিল—ওয়াণ্ডারফুল, ভাল বলেছেন। কিন্তু তা ছুঁড়ে মেরে তো দামোদরের কপাল ফাটানো যায় না।

—অন্তত মুখে কাদা মাখানো যায় !

আবার সে হেসে উঠেছিল। প্রাণখোলা হাসি। মোটা ভরাট গলার উচ্চ হাসি দামোদরের তটপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তখন স্কুটারটা সামনে। সেটাকে তুলে নেওয়া পর্যন্ত সে ভদ্রতার খাতিরে অপেক্ষা করেছিল। স্কুটারটা ঠেলে রাস্তায় এনে স্টার্ট দেওয়ার আগে দিব্যেন্দু বলেছিল—এবার একটা কথা বলি। রাগ করবেন না। রাগ করলে অবশ্য স্কুটারে চড়ে ছুটে পালাব, নাগাল পাবেন না।

—বলুন। আমি প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি।

—বলছি, বিপাশা নদীর স্রোত ক্ষুরধার। কৌশলের বর্ম পরে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে সেখানে নুড়ি তোলা যায়। কিন্তু সে যেখানে মানবী সেখানে তাঁর হৃদয়ের গভীরতা অতলস্পর্শী। সেখানে আছে একটি মণি বা মাণিক্য, হীরক-দীপ্তি বা প্রবাল-লাবণ্য তাতে। সে যে তুলে আনবে সে ভাগ্যবান। পালালাম। কাল আসব। বলতে বলতে স্কুটারটা স্টার্ট নিয়েছিল।

অর্ধসমাপ্ত ড্যামটার মুখ পর্যন্ত যে রাস্তাটা এসে থেমে গিয়েছিল তখন—ওই রাস্তা থেকেই সে এসেছিল কলোনির দিকে আর দিব্যেন্দু গিয়েছিল মাইথন। ওই রাস্তা থেকে সবে সেও কলোনির রাস্তায় নেমেছে—অমনি ওর স্কুটারটা ফটফট করে উঠেছিল। সে বারেকের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল। কেন ঠিক বলতে পারবে না। দিব্যেন্দুকে সেদিন ভাল লেগেছিল এটা নিশ্চিত—কিন্তু সেটা অনুরাগের কিছু নয়। কনস্টিট্যুশন হাউস থেকে—এখানে এই আজ পর্যন্ত লোকটির চরিত্রের একটি একমুখী গতি এবং গতিটা ঝড়ো বাতাসের মত—ভাল লেগেছিল। স্কুটারটা আওয়াজ দিতেই মনে হয়েছিল চকিতে—বাহনটিও ভদ্রলোক চমৎকার বেছে নিয়েছেন। দেখতে দেখতে সাঁ করে বেরিয়ে গিয়েছিল বাহন এবং সওয়ার। 'হেঁইয়ো মারি জোয়ান' বা 'চলো-চলো

দিল্লী চলো' গোছের একটা বেপরোয়া অথবা বুনো ঘোড়ার মত মানুষ। তার সঙ্গে রসবোধ আছে —তাই রক্ষা, না হলে লোকটি গোঁয়ার হত। বেশ কৌতুক বোধ আছে। যাক, দিল্লীর অপরাধটা, না—অপরাধ নয় ত্রুটি, ত্রুটিটা তার আজ বেশ মিষ্টি ভাবেই মিটে গেল।

পথে আবারও একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল।

লোকটি একটু বেশী এগিয়ে আসে না? যেমন—ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢুকে তারপর একমুখ হেসে বলে—আসতে পারি? এবং তারও উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়ে বলে—নমস্কার! হাত দুটো কপালেও ঠেকায় না—একখানা চেয়ারের হাতল ধরে টানে। আজ অন্তত তাই করেছে সে!

হুঁ। নিজে সে উত্তর নিয়েছিল। এবং মনে মনে আপশোষ করেছিল—তার তরুণ জীবনে দিল্লীর রাজপথে প্রেম-পাগল বা বিলাসীদের সঙ্গে যে-সব ঘটনা ঘটেছে—তার দু তিনটে গল্প শুনিয়ে দিলে হত। যাক—কালও ও আসবে। তখন শুনিয়ে দেবে।

পাঁচ

পরের দিনটা ছিল রবিবার। কোয়ার্টারে সে বসেই ছিল; পড়ছিল; হঠাৎ বেলা দশটা নাগাদ একখানা জীপ এসে দাঁড়িয়েছিল তার দরজায়। জানলার পর্দাটা ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখেছিল —দিব্যেন্দু নামছে! সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক। হ্যাঁ। বোধ হয় মাইথনের কর্তাব্যক্তি। সেদিন অভিনয়ের আসরে প্রথম সারিতে বসেছিলেন।

পরমুহূর্তেই দরজায় কড়ার শব্দ উঠেছিল। বিরক্ত সে হয়েছিল কিন্তু দরজা খুলে না-দিয়ে পারেনি।

দিব্যেন্দুই নমস্কার করে বলেছিল—নমস্কার মিস্ ভট্টাচারিয়া। ইনি আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। একটু বিরক্ত করতে এসেছি আপনাকে।

কথা ইংরিজিতে শুরু করেছিল। এবং তার মধ্যে অফিসের কেতাদুরস্ত ভাবও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

ভদ্রলোক বলেছিলেন—গুড মর্নিং, মে উই কাম ইন?

এতক্ষণে সে নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে বলেছিল—গুড মর্নিং, আসুন। বসুন।

—আপনি বসুন।

দিব্যেন্দু বলেছিল—আমার বস্ আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন। ওই ড্যান্স ড্রামা সম্বন্ধে।

—আমাকে? কি কথা?

ভদ্রলোকটি বলেছিলেন—কেমন লেগেছে আপনার?

—এত লোক থাকতে আমার মত জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

—দরকার আছে। আপত্তি না থাকলে অবশ্য বলতে বলছি।

আমার বেশ ভাল লেগেছে। তাই বা কেন—চমৎকার হয়েছে। অবশ্য মাইনাস ওই ড্যামের ডামিগুলি শেষকালে দেখিয়ে—সুন্দর জিনিসটি যথেষ্ট।

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বললেন—আর একটু ডেলিকেট প্রশ্ন করতে পারি? মানে—।

—বলুন?

—অর্থাৎ এতে এমন কিছু ছিল যাতে আপনি আহত হতে পারেন বা হয়েছেন? সবিস্ময়ে সে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। মনও সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। এ কি প্রশ্ন? কিন্তু বুঝতে পারলে না কি উত্তর দেবে?

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—মিস ভট্টাচারিয়া, বলুন, উনি কি কাল আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলেন এ জন্যে?

সে দৃঢ়স্বরে বলেছিল—না। ড্যান্স-ড্রামা দেখে আমার আহত হবার কোন কারণ ঘটেনি। উনি আমার কাছে ক্ষমা চাইতে আসেন নি। বরং আমারই নিজের—

এবার দিব্যেন্দু বলেছিল—না মিস্ ভট্টাচারিয়া, আপনার আমার মধ্যে যদি আমার কোন ত্রুটি থাকে, কোন অন্যায় থাকে, তা আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন—কিন্তু আপনার ত্রুটি এক্ষেত্রে উল্লেখের কথা নয় এবং তা নিশ্চয়ই উনি জানতে চাচ্ছেন না।

সে বলেছিল—তাই কি ঠিক? প্রশ্ন করেছিল অফিসারকে।

তিনি এবার একটু হেসে বলেছিলেন—হাঁ, তাই ঠিক। তাতে আপনাদের পুরোনো কথা জানাতে হবে। এবং আপনার কি অন্যায় সেটা জানতে চাওয়া বা জানা আমার অধিকারের বাইরে।

বলেই তিনি বলেছিলেন—আমি আপনাকে বিরক্ত করবার জন্যে খুব দুঃখিত। কিন্তু মিস্টার চ্যাটার্জিকে আমি স্নেহ করি, সুতরাং তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ হলে আমাকে সতর্ক হয়ে কঠোরভাবে তদন্ত করতে হয়। এবং আপনার প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান সেও একটা কারণ। যাই হোক —আমি উঠি। মার্জনা করবেন আমাকে।

—কিন্তু, কিন্তু কি ব্যাপার আমি জানতে পারি না?

—ওই ড্যান্স-ড্রামায় মিঃ চ্যাটার্জি আপনাকে ইঙ্গিতে অপমান করেছেন—আপনি আহত হয়েছেন মনে মনে। প্রতিবাদ করেছেন। দরখাস্ত করেছেন। চ্যাটার্জি ক্ষমা চেয়েছেন ইত্যাদি। আচ্ছা—। নমস্কার।

—নমস্কার। মুখে বলেও হাত তুলতে ভুলে গিয়েছিল সে।

সংসারে মানুষগুলো কি? এত কদর্য কেন?

—নমস্কার। আমিও যাই। দিব্যেন্দু বলেছিল।

—একটু থেকে যেতে পারেন না?

দিব্যেন্দু অফিসারকে বলেছিল—স্যার, আমি একটু থেকে যাই, আপনি যদি অনুমতি দেন।

—ওঃ—সার্টেনলি! উইশ ইউ গুড টাইম।

—কি হয়েছিল বলুন তো?

—বলছি। আগে—চা খাওয়াতে অসুবিধে হবে? রাগ হলে আবার আমার গলা শুকিয়ে যায়।

—ঠাণ্ডা জল খান না তার থেকে।

—অগত্যা, অবশ্য। দিন, তাই দিন। দুধের স্বাদ ঘোলে, চায়ের তেষ্টা জলে! দিন।

এবার হেসে ফেলেছিল বিপাশা। বলেছিল—চা দেব না বলি নি। বলতে চেয়েছিলাম, ততক্ষণ জল খেয়ে ঠাণ্ডা হোন। চুড়কি, দু-কাপ চা করো। জলদি!

বলে ও ঘরে গিয়ে ফল এনে নামিয়ে দিয়েছিল। দিব্যেন্দু সঙ্গে সঙ্গে বাদাম কয়েকটা তুলে নিয়ে বলেছিল—বাঃ! বাদাম ভারী চমৎকার জিনিস!

—বলুন তো মিঃ চ্যাটার্জি, কি হয়েছিল?

—কি আবার? শুনলেন তো সবই। গত কাল রাত্রে, মানে বিকেলবেলা এখানে আপনার সঙ্গে দেখা করেছি—খবরটি সঙ্গে সঙ্গে মাইথন পৌঁছেচে। পরশু রাত্রে গ্রীনরুমে আমার সঙ্গে আপনি দেখা করলেন—কয়েকটা কথা আমাদের হল বক্রভাবে বঙ্কিমপন্থায়, সেই সূত্রপাত। তার উপর আপনার মত শুভ্রাঙ্গিনী, স্বর্ণাভ কেশিনী! ব্যাস, আর যায় কোথায়? ওরা সবাই হয়ে গেল খুদিয়ার মত। মনে মনে রাগ, মুখে বলল—হায় কৃষ্ণাঙ্গ বীর! অনেক কল্পনা এবং কাল বিকেলে যখন এলাম তখন আর ওদের সইল না এবং অনুমানেও বাধল না যে নৃত্যনাট্যে আপনি চটেছেন। আপনাকে অপমান করা হয়েছে। নিশ্চয় আপনি দরখাস্ত করেছেন। সুতরাং তারা বেনামী পত্র লিখে আপিসের ডাক বাক্সে রাত্রে রেখে এসেছে। সকালে বস্ সেই পত্র পেয়ে আমাকে তলব। তখন আমি বললাম—বেশ তো, ওঁকে ডাকুন, ডেকে সোজা জিজ্ঞাসা করুন। বললেন অবশ্য—না, তুমি বল। আমি বললাম—না স্যার, এটা আমার নামে অপবাদ। এটারও তদন্ত আপনাকে ওঁর কাছ থেকেই করতে হবে। উনি বললেন—তা হলে পর্বতকে মহম্মদের কাছে যেতে হবে। চলুন। তিনি যদি বলেন, আমি মাপ তো চাইবই, চাকরি ছেড়েও চলে যাব।

চুড়কি চা এনে নামিয়ে দিল।

—বিস্কুট খেলেন না?

—না। মেওয়া খেলাম। আপনি বোধ হয় ছেলেবেলা থেকেই খান!

—হ্যাঁ।

—তাই।

—তাইটা কি?

—মেওয়া খেলে রঙ ফরসা হয়। মেওয়ার রক্ত! ব্লু ব্লাড বলে না? ওটা মিল্ক ব্লাড! জানেন, ছেলেবেলা বেনারসে রোজ গঙ্গা স্নান করতাম এবং অন্তত আধঘণ্টা ধরে গঙ্গার পলি মাটি মাখতাম। কেন? না—রঙ ফরসা হবে। তারপর অন্তত আবার আধঘণ্টা সাঁতার।

উঠে গিয়েছিল বিপাশা। ও ঘর থেকে আরও কিছু মেওয়া নিয়ে ফিরে এসে বলেছিল—তারপর?

—সে আর কি শুনবেন! যত আনইন্টারেস্টিং জীবন-কথা!

* *

—বাঃ বাঃ বাঃ! কাল আমার কথা তো সব শুনে নিয়েছেন! বেশ তো লোক!

হেসে দিব্যেন্দু বলেছিল—শহুরে চোর আর গেঁয়ো চোরের গল্প জানেন?

—সেটা কি?

মানে দুই চোর অ্যাবস্কণ্ডার হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় একটা গাছতলায় মিলেছিল। এবং হাব-ভাবে আকারে-ইঙ্গিতে রকমে-সকমে নিজেদের এক গোত্রের লোক বলে চিনে কথাবার্তা শুরু করেছিল। এখন দুজনের কাছেই কিছু কিছু খাদ্য অথচ তাতে পুরো পেট কারুর ভরবে না। এর কাছে চিঁড়ে ওর কাছে দই, এর কাছে কলা ওর কাছে গুড়, এমনি আর কি। তখন দুজনে খাদ্য এক জায়গায় মিশিয়ে খেতে বসল। এখন শহুরে চোর বললে—খেতে খেতে গল্প কর ভাই। বল, তোমার কথা বল। কে কে আছে বাড়িতে! বলতেই গেঁয়ো চোর বলতে শুরু করল—বাপ, মা, ভাই বোন স্ত্রী পুত্র, না-ছিল কি? আজ আর কেউ নেই। শহুরে বললে—আহা! কি হল? গেঁয়ো বিগলিত হয়ে বললে—বাপ প্রথম গেল। হল টাইফয়েড। বাস্ বর্ণনা চলল। শেষ যখন শেষজনের মৃত্যু বর্ণনা শেষ করলে—তখন দেখে গল্প বলতে গিয়ে সে হাত গুটিয়ে বসে আছে। আর শহুরে ইতিমধ্যে দুজনের খাদ্য একাই শেষ করে এনেছে। তখন চাতুরী বুঝে সে বললে—এবার তোমার কথা বলো ভাই। শহুরে বললে, নিশ্চয়। আমার ভাই মা বাপ ছেলেবেলায় মরেছে, মনেই নেই। তারপর বিয়ে করলাম। গেঁয়ো বললে—হুঁ। তার পর? শহুরে বললে—তারপর আর কি, অসুখ করল। গেঁয়ো বললে—কি অসুখ? শহুরে বললে—জ্বর হয়ে ফুলল। গেঁয়ো বললে—ফুলল? শহুরে বললে—হুঁ। গেঁয়ো বললে—তারপর? শহুরে বললে—তারপর আর কি, ফুলল—আর মরল। বাস্। বলতেই অবাক হয়ে গেল গেঁয়ো। শহুরে ইতিমধ্যে বাকী খাদ্যটুকু খেয়েদেয়ে উঠে ঢেঁকুর তুলে বললে—চল, ঘাটে জল খেয়ে একটা বিড়ি খাই। আছে নাকি?

হেসে ফেললে বিপাশা—তার মানে, আপনি শহুরে আমি গেঁয়ো।

—হে ভগবান! শুভ স্বর্গ! মানে গুড হেভেন্‌স্! তাই বলতে পারি? আপনি আসছেন রাজধানী থেকে। যে দিল্লী দূর অস্ত, যে দিল্লীর দেওয়ানী খাসে নাকি লেখা আছে হামিনস্ত এই স্বর্গ, সেই দিল্লী থেকে। তবে বলছি—আমার জীবন ঐ শহুরে জীবনের মতই সংক্ষিপ্ত!

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল সে। বলেছিল—তবে এক জায়গায় আপনার সঙ্গে আমার একটা মিল আছে। আপনিও বাল্যে পিতৃমাতৃহীন, আমিও তাই। বাবা এক বছরে, মা—পাঁচ বছরে। আপনার তবু তাঁদের মনে আছে। আমার কোন স্মৃতিই নেই। মা-বাবার স্মৃতি বড় পবিত্র। বড় পবিত্র এবং আশ্চর্যের কথা—।

তার কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ এমন গাঢ় এবং বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল যে অকস্মাৎ শরতের দুপুরে ঘনকৃষ্ণ মেঘ এসে সব ছায়াচ্ছন্নই করে দেয় নি—ঝিমি ঝিমি বর্ষণে সে বিষণ্ণতাকে সজল করেও তুলেছিল। দিব্যেন্দু যে এমন বিষণ্ণ বেদনাচ্ছন্ন হতে পারে সে তা কল্পনাও করতে পারে নি।

হঠাৎ সে থেমে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—জানেন আমার কতবড় দুঃখ? এই যুগ—এই যুগে বাবা ছিলেন এঞ্জিনিয়ার, বিলেত গিছলেন, মা আমার ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন,

মাতামহ ছিলেন ছোটখাটো হলেও গভর্নমেণ্টের গেজেটেড অফিসার—অথচ মা-বাবার মধ্যে কারুর ফটো নেই !

চোখ তার জলে ভরে উঠেছিল।

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বিপাশা। মনে হয়েছিল জলের মধ্যেও নাকি আগুন থাকে। তার নাম বাড়বানল। যে জল বাতাসের মধ্যে থাকে তা পাহাড়ের মাথায় শীতের রাত্রে অকস্মাৎ একদিন তুষারের ফুল হয়ে ঝরে। তার মধ্যেও কি আগুন থাকে ?

টপ-টপ করে চোখের জল ঝরতেই দিব্যেন্দু রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে বলেছিল—প্রথম প্রথম দাদামশায় দিদিমা উত্তর দিতেন না। আমার দিদিমা। ওঃ, সে এক খাণ্ডারনী ছিলেন বটে, আমার মায়ের অধিক—আমাকে সেই বুড়ীই মানুষ করেছিলেন—কিন্তু খাণ্ডারনী বটে ! ওঃ, সে গালাগাল যা দিতেন না—সে একেবারে গঙ্গাস্তবের মত 'বন্দীমাতা সুরধুনি, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিতপাবনী পুরাতনী'—গোছের মিলিয়ে মিলিয়ে। লক্ষ্য তার কন্যা, জামাতা, পুত্রদ্বয়, কিন্তু তাঁদের তো পেতেন না—সুতরাং উপলক্ষ্য নিয়েই তা দিয়েই কর্ম সমাধা করতেন। লক্ষ্য তাঁদের পুত্র কন্যা জামাতা, 'আমি' ছিলাম উপলক্ষ্য এবং পুত্র পুত্রবধূ হলে তাদের পিতৃ ও শ্বশুর তাঁর নিজের স্বামী ছিলেন উপলক্ষ্য। আমাকে বলতেন—

'আবাগীর বেটা, ওরে পাষণ্ডের পুত,
আমাকে অশান্তিনলে জ্বালাইলি প্রতিফলে,
অনন্ত অনন্ত কাল হয়ে থাক ভূত !'

হেসে বলেছিল—ওগুলো অবশ্য ছন্দে গেঁথে নিয়েছিলাম আমি। ভুলে গেছি সব এখন। ওই দিদিমা আমার মা এবং বাবার ছবি বিসর্জন দিয়েছিলেন, তাও গঙ্গায় নয়, উনোনের আগুনে। বুঝেছেন। বাবা বিলেতে মারা গেলেন—খবর আসতেই মায়ের মাথা খারাপ হয়। তিনি বিধবা সাজবেন না। তিনি মন্দিরে গিয়ে আবিষ্কার করলেন—ঠাকুর তার স্বামী। আমাকে ফেলে দিলেন মাটিতে। এবং শেষে আমায় পাঁচ বছরের রেখে তিনিও গেলেন। শুনেছি আত্মহত্যা করেছিলেন। কথাটা কিছুতেই বলেন নি। দাদামশায়ের সঙ্গে তীর্থে গিয়েছিলেন, সেই তীর্থে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেইজন্যে দিদিমা মাকে যে গালাগালি দিতেন—অবাগী, অর্থাৎ অভাগী, দগ্ধকপালি, পিণ্ডিখাগী ছাইখাগী বলে—সেগুলো আমার বেশ ভালই লাগত। আজও দিদিমাকে মনে পড়লে বলি—

খাণ্ডারনী রূপিণী তুমি দিদিমা লোলরসনা,
তোমার তুলনা নাস্তি ডেপুটি স্বামীশাসনা—
কন্যা জামাতা তব পাপেতে প্রেতা প্রেতিনী,
পুত্র পুত্রবধূ তব ভয়েতে দূরবাসিনী।
তবুও তুলনা নাস্তি—দিব্যেন্দু জীবন-পালিকা—
এ স্তব আমার দেবী অম্লান ভক্তি-মালিকা।

সত্যিই তার তুলনা নেই ! শী ওয়াজ ওয়াণ্ডারফুল। ওঃ, দাদামশায়কে যখন তেড়ে যেতেন

এবং মুখের কাছে মুঠি বাঁধা হাত নেড়ে বলতেন—কানা, যবনের এঁটোখেগো,-গেলাম, সব অনর্থের মূল তুই।

দাদামশায় ভয় পেয়ে বলতেন—চোখের কাছে এমন করে হাত নেড়ো না, চশমাটা ঠিকরে পড়ে গেলে ভেঙে যাবে। এ লেন্সের দাম অনেক, এখানে পাওয়া যাবে না।

ওটাই ছিল দাদামশায়ের অমোঘ অস্ত্র। চশমা ভেঙে গেলে অনেক টাকা খরচ হবে। দিদিমা অগত্যা কাঁদতে শুরু করতেন। অবশ্য সুর করে বিলাপ করতেন না। কারণ হাজার হলেও গেজেটেড অফিসার-পত্নীর ট্রেনিংটা ছিল। নিরস্ত হয়ে বলতেন—মনে থাকে না আমার। আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে! আমি তো কোন পাপ করি নি। কো-ন-ও পাপ করি নি। তবে? আমার এ দুঃখ কেন? এ শাস্তি?

দাদামশায় বলতেন—হ্যাঁ। রেসপনসিবল্ আমি।

দিদিমা কাঁদতেন। দাদামশায় স্বীকার করতেন—পাপ! হ্যাঁ, এও পাপ বইকি। আচারই পাপ!

এবং সেটা হল তাঁর যৌবনের সাহেবিয়ানা, তিনিই উৎসাহিত করেছিলেন ছেলেদের সাহেবিয়ানায়। তিনিই তালিম দিয়েছিলেন। হয়তো আজ বেঁচে থাকলে আমাকেও ম্লেচ্ছ যবন বলে কপালে করাঘাত করতেন। আপনি—না, আপনি যদি যেতেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে তা হলে কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না আপনি বাঙালী, আপনি হিন্দু—আপনি এদেশী।

এই ভাবেই সেদিন শেষ হয়েছিল। এরপর ঠিক এইখ নেই চুড়কি এসে বলেছিল—নেহাবে না? বাতই করবে সারাদিন?

দিব্যেন্দু ঘড়ি দেখে বলেছিল—ওঃ ফাদার, এ যে বারোটা! আজ উঠলাম।

সে অপ্রতিভ এবং বিব্রত হয়েছিল। এই দুপুরবেলা সে স্নান করবে, খাবে আর দিব্যেন্দু যাবে এখন মাইথন! অথচ থাকতে, স্নান আহার করতে বলতে বাধছে। লোকে কি বলবে। এখানকার লোকের মনের ও জিভের যে পরিচয় সে পেয়েছে তাতে—!

দিবেন্দু তখন ঘরের বাইরে গেছে। হঠাৎ হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠেছিল—হে—! হে—! হে—! বলেই ছুটতে আরম্ভ করেছিল। সেও বাইরে এসেছিল। একখানা ট্রাক যাচ্ছিল—তাকেই হে-হে শব্দে চীৎকার তুলে থামিয়ে সে ওতেই উঠবে।

সে এই লোকটির আচরণের মধ্যে আশ্চর্য প্রাণবন্ত গ্রাম্যতা বা অসভ্যতা দেখে বিস্মিত হয়েছিল। এর কিছুতে বাধে না!

গাড়িটা চলে গিয়েছিল। এবার সে নেমে এগিয়ে গিয়ে তাকে ডাকবে বলেই স্থির করেছিল। যে যা বলে বলুক। কিন্তু এগিয়ে যেতে সে দেখেছিল পথের উপর সাইকেল আরোহী এখানকার অফিসারকে। সাইকেলসুদ্ধ ধরে তাকে নামিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে চেপে মাইথন পাড়ি দিচ্ছে তখন।

তবু সে ডেকেছিল—শুনুন—শুনুন মিঃ চ্যাটার্জি!

কে শুনবে? দুপুরে রোদে মোটা গলায় নৃত্যনাট্যের একটা গান ধরে সে সাইকেল চালিয়ে

ছুটেছে।—চল রে—চল রে—চল রে—

যা পড়ে সমুখে প্রলয় নৃত্যে সবল চরণে দলরে।

এর পর নৃত্যনাট্যে সঙ্গিনীরা কোরাসে ধ্বনি তুলেছিল—

তোল্ কল্লোল্—কল্ কল্ কল্—থল্ থল্ থল্—

কল্ কল্ কল্ কল্ রে—

চল্ রে!

এর পর নিজেই সে বিকেলে গিয়েছিল মাইথন।

মাইথন কলোনীতে পথে অনেকেই তাকে দেখে অর্থপূর্ণ বৃষ্টিপাত করেছিল। সেটা তার কাছে সহজেই বোধগম্য হয়েছিল। কিন্তু সে গ্রাহ্য করে নি! তাদেরই প্রশ্ন করেছিল—অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এঞ্জিনীয়ার মিস্টার চ্যাটার্জির বাংলো কোন্‌টা বলতে পারেন?

তারা অসম্ভ্রম করে নি। ভদ্রতার সঙ্গেই দেখিয়ে দিয়েছিল—ওই যে। ওই দুটোর পর। ওইটে।

দিব্যেন্দু তখন বাগান কোপাচ্ছিল একা একা। তাকে দেখেই সবিস্ময়ে কোদাল ফেলে এসে বলেছিল—আসুন, আসুন! কি ব্যাপার? কি কাণ্ড! আপনি এলেন কেন? এলেন কিসে?

সে হেসে বলেছিল—ক্ষমা চাইতে এসেছি। এসেছি ট্রাকে।

—ক্ষমা? কিসের ক্ষমা?

—ত্রুটির ক্ষমা।

—ত্রুটি কিসের?

—আগে ভেতরে চলুন। ওই দেখুন, দূরে কৌতূহলীরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। এবং ক্রমশঃ ভিড় বাড়ছে। বলে সে নিজেই ঠেলে ভিতরে ঢুকেছিল। বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে আবার উঠে বলেছিল—না চলুন, ভিতরে যাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে। ওরা একটু ভাবুক।

ভিতরে এসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বলেছিল—বাঃ, আপনি তো চমৎকার গোছানো লোক! সুন্দর গুছিয়ে রেখেছেন তো। নিজেই রাখেন? না? না—ভাল চাকর আছে?

—ওটা আমার ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস। বোধহয় মাতৃস্নেহের অভাবের ওটা কমপেনসেশন। দাঁড়ান, আমি আসছি। হাত-মুখ ধুয়ে একটু ভদ্র হয়ে আসি।

—আগে ত্রুটি স্বীকারটা করে নিই।

—না। তাহলে কথা ফুরিয়ে যাবে আপনার। আপনি উঠবেন।

—না। চা খাব। এবং বাদাম খেলে রঙ যেমন ফরসা হয় তেমনি যা খেলে—রঙ চোখ চুল কালো হয় তাই খাব। বলুন তো সে বস্তুটা কি?

—তেল মেখে মুড়ি।

—চমৎকার। এখন শুনুন। আমার অত্যন্ত অপরাধ হয়ে গেছে। সেই দুপুরে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি—অস্নাত অভুক্ত। মেয়েদের পক্ষে এর চেয়ে কি অপরাধ হতে পারে? আপনাকে ডেকেছিলাম। কিন্তু আপনি অদ্ভুত। একজনকে—

হেসে উঠে দিব্যেন্দু বলেছিল—ঘোষ আমার কলীগ! সেও অবাক হয়েছে। বাইসিক্লটা ধরে বললাম—নামো। নামতেই চড়ে বসে বললাম—নিয়ে চললাম, পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এটাকে আপনি এত বড় করছেন কেন?

—কারণ অন্তরে সেটা অনুভব করেছি।

—কিন্তু আমরা বন্ধু। অন্তত আমরা দুজনে বাল্যে পিতৃমাতৃহীন বলে বন্ধু হতে পারি।

—সেই জন্যেই দুঃখ বেশী পেয়েছি মিঃ চ্যাটার্জি।

—তা হলে দিব্যেন্দু বলতে বলব!

—বলব। দিব্যেন্দুবাবু—

—আমি বিপাশা দেবী বলব।

-- বলবেন।

চারদিনে তারা পরস্পরের কাছে দিব্যেন্দুবাবু এবং বিপাশা দেবী হয়ে গিয়েছিল।

বাঁধন তখনই অনুভব করেছিল।

তারপর মাসখানেক যেতে-না-যেতে হয়েছিল দিব্যেন্দু বিপাশা। তারপর দিব্য এবং বিয়াস। আপনি থেকে তুমি। তখন ফুলের সময়। দামোদর বরাকর খুদিয়ার দুই তটে তটে সে কি কুরচি ফুলের সমারোহ। বর্ষা নেমেছে। নদীগুলি ভরে উঠেছে। গেরুয়া জল কানায় কানায়। নদীতে সত্যিই ডাক উঠেছে। কল কল্লোল। এ যখন আসে তখন আশ্চর্য সমারোহ। সে কি সঙ্গীত চারি-দিকে। আকাশে মেঘ গুরু গুরু শব্দে ডাকত। সে শুয়ে শুয়ে ভাবত—দিব্য কি করছে?

নদীর ধারে কতদিন দুজনে ভিজেছে বৃষ্টিতে।

লোকের মুখরতার আর বাকী ছিল না।

তবু বিবাহের কথা বলে নি। অন্তরে বলা হয়ে গিয়েছিল। মুখে বলতে বাকি ছিল। থাকলেও তাতে সে অন্তত নিঃসন্দেহ ছিল।

দিব্যেন্দু একদিন বলেছিল—যে কথা বলা প্রয়োজন বিয়াস, সেটা অনুক্তই থাক। বললেই যেন তোমাকে জয় করার ও পূর্বরাগের যে আনন্দ সেটা ফুরিয়ে যাবে!

চুড়কি জিজ্ঞাসা করত—তুমাদের বিয়া হবে কবে?

সে বলত—হবে-হবে। তোকে একজোড়া ডুরে কাপড় দেব।

—তা দিয়ো। তবে বিয়াটি কর ক্যানে।

—কাপড়টা তাহলে কালই বলব এনে দিতে।

—উঁহু। তা বুলি নাই। বুলচি বিয়াটি বাকি রাখছ ক্যানে?

মাদার গ্রাহাম তাকে প্রশ্ন করেছিলেন—বিয়ে তোমাদের ঠিক হয়ে গেছে? সেটেল্ড্?

সে বলেছিল—ইয়েস, মাদার গ্রাহাম!

* * *

সেই দিব্যেন্দু এইভাবে অকস্মাৎ যেন চোরের মত লুকিয়ে গেল, পালিয়ে গেল? কেন? সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। তবে আজও সে তাকে প্রতারক বলে ভাবতে পারে না। না। সে তা

ভাবতে পারবে না। কিন্তু এ অঞ্চলে কথাটা যেন দামোদরের বন্যার মত ছড়িয়ে পড়েছে। জানা-জানি হয়ে গেছে। সকলেই বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে বক্রহাসি হাসছে! কি করবে সে? হে ভগবান!

দিব্যেন্দু! কি হল দিব্যেন্দুর!

তার নিজের জীবনে কোন গ্লানির কারণ সে ঘটিয়ে যায় নি। তার মনে তার আসন অক্ষয় হয়ে গেছে। সারাটা জীবন কোন অভিযোগ না করে—পবিত্র বেদনা-বিধুর চিত্তেই সে আসন পেতে রেখেই প্রতীক্ষা করতে পারবে। কিন্তু তার অপবাদ সে সহ্য করবে কি করে? এবং তার কি হল?

চুড়কি এসে বলল—কি থাবেক্ বুলো।

সে বললে—কিচ্ছু না। তুই যা।

বাইরে এই মুহূর্তে কড়া নড়ল। চমকে উঠল সে—কে?

—আমি। মাদার গ্রাহাম।

—মাদার গ্রাহাম? দরজা খুলে দিলে সে। প্লিজ কাম ইন। আসুন—বাইরে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। সন্ধেবেলা এসেছি।

চেয়ার টেনে নিয়ে মাদার গ্রাহাম বললেন—আমি শুনলাম সে পালিয়েছে!

—কে?

—চ্যাটার্জি! আমি জানতাম! তোমাকে আকারে ইঙ্গিতে আমি বারণ করেছিলাম।

—এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমি অনিচ্ছুক মাদার গ্রাহাম।

—আমি তোমার ভালোর জন্যে বলতে চেয়েছিলাম মিস ভট্টাচারিয়া।

—প্লাজ মাদার গ্রাহাম!

—মাঝখানে ইংল্যাণ্ডের একটি দম্পতি মাইথন দেখতে এসেছিলেন। মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস অ্যাণ্ডার্সন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। চ্যাটার্জি দেখাচ্ছিল সব। যাবার সময় তিনি আমাকে বলে গিয়েছিলেন। তিনি ওর মুখ দেখে ওকে চিনেছিলেন। ওর বাবাকে তিনি জানতেন। তিনিও এঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তিনি বলে গিয়েছিলেন ওর বাপ ছিল প্রতারক। অ্যাণ্ড—

—হোয়াট মোর মাদার গ্রাহাম?

—এ ছেলে তাঁর বিবাহিত স্ত্রীর সন্তান নয়। ব্যাস্টার্ড—জারজ—

—মাদার গ্রাহাম!

—জারজ ব্যাস্টার্ড কথাটা রূঢ়; তবে সে তাই—

—মাদার গ্রাহাম, আপনি প্লীজ—

সে আঙুল দেখিয়ে দিল দরজার দিকে। যান, আপনি যান।

মাদাম গ্রাহাম চলে গেলেন, বলে গেলেন—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। সে তোমার চরম ক্ষতি করে নি। ওর মা ছিল হার্লট। এলিস অ্যাণ্ডার্সন একজন অত্যন্ত সৎ ইংরেজ মহিলা। আমার কাছেই শুনেছিলেন তোমার কথা ওরই প্রসঙ্গে। তাই তোমাকে সাবধান করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন—মাদার গ্রাহাম, একটি কুমারীর জীবন এইভাবে নষ্ট হবে! তুমি ওকে বোলো।

বোলো ইংরেজ মহিলা মিথ্যা বলে না। কিন্তু আমি তখন পারি নি বলতে। কি করে বলব? আজ বলছি। কারণ এইভাবে চলে যাওয়াটাই তার এই জন্ম-কলঙ্কের একটা বড় প্রমাণ। গুড নাইট।

বিপাশা ছুটে গিয়ে দেওয়ালে নিজের মাথাটা ঠুকলে।—হে ভগবান!

চুড়কি অবাক হয়ে শুনছিল আড়াল থেকে। ইংরাজী কথা বুঝতে পারে নি, কিন্তু একটা প্রচণ্ড শঙ্কাজনক কিছু তা বুঝতে বেগ পেতে হয় নি। সে ছুটে এসে তাকে জাপটে ধরলে।

—কি করছ? না-না! না!

টেনে এনে সে তাকে শুইয়ে দিল বিছানায়। এবং তার পাশে বসল মায়ের মত। বিপাশা কাঁদতে লাগল। চুড়কি শুধুই বললে—তাকে তুমি খুঁজে ধর। ছেড়ে দিবে ক্যানে? ধর তাকে। কেঁদো নাই।

ছয়

ঘণ্টা কয়েক লাগল তার আত্মসম্বরণ করতে। প্রায় রাত্রি দুটোর সময় সে উঠল। চুড়কি ঢুকছিল। তাকে বললে—তুই শুগে যা চুড়কি, ঘুমিয়ে নে একটু।

—তুমি?

—আমি ঠিক আছি, তুই ভাবিস নে।

কিন্তু চুড়কি বিশ্বাস করতে পারলে না। সে ওই ঘরেই মেঝের উপর শুয়ে রইল। চেষ্টা করতে লাগল জেগে থাকতে। ইংরাজী কথাবার্তা বুঝতে সে পারে নি, কিন্তু এটা সে বুঝেছে—দিব্যেন্দুকে নিয়ে যা ঘটেছে তাতে এই মেয়েটির পক্ষে এখন সব কিছু করাই সম্ভবপর। সে জানে তাদের মেয়েদের গাছের ডালে গরুর দড়ি বেঁধে গলায় লাগিয়ে ঝোলার কথা। বিষ খাওয়ার কথা। নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা!

বিপাশা স্থির হয়ে বসে ভাবলে কিছুক্ষণ। তার জীবনের সেই নিবিড় তিমির নিশীথিনীর মত দিনগুলির কথা মনে করলে। এ যেন তার থেকেও অসহনীয়। আরও গাঢ়, নিবিড়তম তিমিরঘন কাল রাত্রি! ভগবানও বুঝি এখানে মৃত! সে নিশীথিনীতে যা এসেছে ভয়ঙ্কর ভীষণ সব কিছুকে স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখে ধরা গেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে পার হয়েছে, অতিক্রম করেছে ভীষণকে ভয়ঙ্করকে। সামনে দূরে ছিল সীমান্ত এলাকায় আলো এবং অন্ধকারের সীমারেখা। আর এর যেন শেষ নাই, অকস্মাৎ কোন দূর অতীতের পুঞ্জীভূত অন্ধকার সাইক্লোন হ্যারিকেনের মেঘের মত পিছনের দিগন্ত থেকে এসে তাকে আবৃত করে ভবিষ্যৎ কাল পর্যন্ত এগিয়ে গেল। একটা প্রেতিনী যেন পিছনে থেকে তার কৃষ্ণবর্ণ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে সারা আকাশে কালো মাখিয়ে আলো ঢেকে দিলে।

তাহলে কি মাদার গ্রাহাম তার পরিচয় জেনেছে—এইটে জানতে পেরে সে পালাল? তা ছাড়া আর কি হতে পারে? হায় দিব্যেন্দু, তুমি সত্যকে গোপন করলে কেন? তুমি প্রথম যেদিন তোমার কথা বলেছিলে সেদিন মনোহরভাবে তোমার বাবা-মায়ের রচনা করা মৃত্যুকাহিনী

বলে চোখের জল ফেলেছিলে। সে জলে বিপাশার অন্তরলোক সজল হয়ে তৃণাঙ্কুর মেলে সবুজ হয়েছিল। কেন তুমি ওই চোখের জল ফেলেই জবালাপুত্র সত্যকামের মত বল নি—আমার বাবা মা-কে আমি দেখি নি বিপাশা—তাঁদের কথা এইটুকু বলতে পারি, তাঁরা পাপের পঙ্কে বাসর সাজিয়ে মিলিত হয়েছিল, সেই পঙ্কবাসরে হয়েছিল আমার জন্ম। আমি সেই পঙ্কতল থেকে পঙ্কজের মত ফুটতে চাই। জীবকের পূজা নিবেদন করতে চাই আলোক-আকর সর্বপাপঘ্ন দেবতার পায়ে। বলতে পারতে, আমি রক্তকমল নই—শুভ্রকমল নই, আমার বর্ণ ওই পঙ্কের মত কৃষ্ণ—আমি কৃষ্ণকমল। দিব্যেন্দু, আমি তাহলে বলতাম কি জান? বলতাম, তুমি দিব্যকমল দিব্যেন্দু, আমি শ্বেতভ্রমরী। তোমার মর্মলোকে আশ্রয়ের জন্যই আমার বোধহয় সৃষ্টি হয়েছিল! ওঃ, প্রতারক বলেই তা তুমি পারলে না। ছি-ছি-ছি! করলে কি। জান না তুমি, বুঝতে পারবে না, বিপাশাকে কি রিক্ততার মরুভূমিতে তুমি দাঁড় করিয়ে দিলে। জীবনে কোন ভদ্রজনকে বিশ্বাস করতে পারব না। ভালবাসার কথা দূরেই থাক। জীবনে তোমার কবিতার বিপাশার মতই আমি ব্রতচারিণী হয়ে কাটিয়ে দেব—অজ্ঞতার অন্ধতার পাশই মোচন করব। তুমি আমাকে চিনলে না। আমি এক দুর্লভা কন্যা, আমি কতকাল পরে পরে জন্মাই—বিপর্যয় বিপ্লব করে দিয়ে যাই কুলে বংশে। আমার সাধ্য অনেক! আমি দুর্লভা শ্বেতভ্রমরী, আমি বসতাম কৃষ্ণকমলে, সৃষ্টি করতাম দিব্যকমলের! সংস্কারকে জয় করে—। আবার তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। সে উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানালায়। পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে চাইল আকাশের দিকে। পূর্ব দিগন্তে শুকতারা উঠেছে। ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে নীলাভ দীপ্তি নিয়ে। সেই দিকে তাকিয়েই সে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ তার আর একটা কথা মনে হল। এই কারণেই কি দিব্যেন্দু তাকে দেবকন্যা গঙ্গা আর নিজেকে অনার্য-পুত্র দামোদর বলে চিত্রিত করেছে নৃত্যনাট্যে? সজ্ঞানে? না!

সকাল হতেই সে একখানা চিঠি লিখে চুড়কিকে বললে—মাদার গ্রাহামকে দিয়ে আসবি। পরে, এখন নয়। এখন চা কর।

মুখ হাত ধুয়ে রাত্রের কাপড় জামা বদলে বসল সে। সে যাবে—খুঁজতে যাবে দিব্যেন্দুকে। তাকে বের করা তার চাই। তার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটা প্রশ্ন সে করবে শুধু। শুধু কয়েকটি প্রশ্ন।

—"এই কারণেই কি তুমি বলেছিলে মুখ ফুটে, শেষ কথাটা অনুক্ত এখনও থাক বিয়াস। পূর্বরাগের মাধুরী মধু বড় দুর্লভ। আমাকে সুদুর্লভা তোমাকে জয় করবার চেষ্টার আনন্দ উপভোগ করতে দাও।"

সে যদি বলে—হ্যাঁ, তাই।

তবে সে বলবে—অর্থাৎ যথেষ্ট সুযোগ চাইছিলে, যাতে নাকি আমাকে আয়ত্ত করে কোন অতি দুর্বল মুহূর্তে আমার কুমারী জীবন উচ্ছিষ্ট করে পৈশাচিক আনন্দ নিয়ে সরে পড়তে! না?

কি বলবে? জানে না। হয়তো চুপ করেই থাকবে। কারণ ওর মধ্যে দুটো বাস্তব সত্য সে দেখতে পাচ্ছে।

একটা ভয়। অপরটা ওর রক্তগত পাশবিক প্রলোভন।

তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে সেই বলবে—তোমার ওই ভয় দিন দিন প্রবল থেকে প্রবলতর হোক, সে তোমাকে আত্মহত্যায় প্রবুদ্ধ করুক। তোমার পশুত্বের তা নইলে মুক্তি নেই দিব্যেন্দু। তুমি মর দিব্যেন্দু—তুমি মর।

ভাবতে ভাবতে আবারও সে কেঁদেছিল।

মনের সঙ্কল্পেরও যেন পরিবর্তন হয়েছিল। ভেবেছিল—না, মৃত্যু কামনা নয়, 'মর' বলার মত রূঢ় কথা সে বলবে না। বলবে—তোমাকে ধন্যবাদ দিব্যেন্দু, তোমাকে লক্ষ ধন্যবাদ।

তারপর আবার একবার শুয়েছিল। দেহে ক্লান্তির আর সীমা ছিল না। শুধু মনের যন্ত্রণায় যে দেহে এমন যন্ত্রণা হতে পারে এ ধারণা তার ছিল না। মনে পড়ছে, অমৃতসরে যেদিন তার কলেরা ভ্যাকসিনের প্রতিক্রিয়ায় এবং খাদে পড়ে যাওয়ার আঘাতের ব্যথায় ও সুদীর্ঘ পথশ্রমে যে অবস্থা হয়েছিল সেই অবস্থার কথা। কিন্তু মনের গতি সম্পূর্ণ বিপরীত। সেদিনের মন আশায় পৌঁছে দীর্ঘ রোগমুক্তির প্রসন্নতায় ছিল প্রসন্ন আর আজ একটা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি যেন আক্রমণ করে তার মনকে অজগরের মত গিলছে। শুয়ে সে ঘণ্টাদেড়েক ঘুমিয়েছিল। ঘুম ঠিক নয়—তন্দ্রা। শোকাহত বা নিষ্ঠুর বেদনাকাতর অবস্থায় এক ধরনের তন্দ্রা মানুষের আসে, যে তন্দ্রায় মধ্যে মধ্যে কাঁপানো দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে—সেই ধরনের তন্দ্রা। এক আধবার সে তন্দ্রাও ভেঙে গেছে। মনে হয়েছে—কেউ ডাকছে নয়? কিন্তু না।

সকালের আলো চোখে পড়তেই সে উঠে বসেছে। দেওয়ালে সামনেই একখানা ছবি টাঙান ছিল। নোয়াখালিতে মহাত্মাজী। দীর্ঘ দণ্ডধারী কৌপীনবস্ত মহাত্মা—শ্মশানে, মনুষ্যত্বের শ্মশানে খুঁজতে চলেছেন, প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছেন মানুষের আত্মাকে। ছবিখানা রোজই দেখে, কিন্তু এত কথা কোনদিন মনে হয় না। আজ হয়েছে।

চুড়কি চা এবং পাঁউরুটি ডিম এনে নামিয়ে দিল। পাউরুটির প্লেটেই একপাশে কিছু মেওয়া। এবং বললে—শুনছ, খাও। প্যাটে খিদা থাকলে বল থাকে নাই। কিছু খেয়ে বল করে লাও। তবে মনটো দড় হবেক। না করো নি। হাঁ।

ভাল লাগে, চুড়কির এই স্নেহ তার ভাল লাগে। আজ আরও ভাল লাগল। সে বললে—কাল তুই রাত্রে কি খেয়েছিলি?

—সে কিছু-মিছু খেয়েছিলুম।

—ভাত?

ঘাড় নাড়লে চুড়কি এবং একটু হাসল।

বিপাশা বললে—জানি। কিছুই খাস নি। তুই খা, কি আছে? পাউরুটি ডিম, যা আছে পেট ভরে খা। আমি এ বেলা ফিরব না। সন্ধ্যের পর ফিরব। হয়তো এসেই আবার বেরিয়ে যাব। আমার সুটকেসে কাপড় জামা এটা ওটা গুছিয়ে দিস। বিছানাটাও। বুঝলি!

—কোথা যাবেক?

—যাব তাকে খুঁজতে। তুই বললি নে? ধর তাকে!

—হঁ। যাও। ঠিক পাবে। বুলছি আমি তুমি দেখো!

—ওই চিঠিটা মাদার গ্রাহামকে দিস।

—দিব।

চা খেয়ে উঠল সে। এখান থেকে যাবে মাইথন। মিস্টার মিত্তিরকে নিয়ে আপিস খুঁজে দিব্যেন্দুর কোয়ার্টারের জিনিসপত্র খুঁজে সে দেখবে তার কোন ঠিকানা পাওয়া যায় কি না! না পেলে যাবে ডি-ভি-সি হেড কোয়ার্টারে কলকাতায়। সেখানে দেখবে যদি কোন ঠিকানা সেখানে রেখে গিয়ে থাকে। সেখান থেকে বেনারস।

তন্ন তন্ন করে খুঁজবে। দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে কাটিয়ে দেবে সকাল থেকে সন্ধ্যা। গঙ্গাস্নানে তার বড় ঝোঁক ছিল। এখানেও প্রায় যেত লেকে সাঁতার কাটতে। সে বসে থাকত আর দিব্যেন্দু অবলীলাক্রমে সাঁতার কাটত। মধ্যে ডুব দিত। এবং উঠে বলত—পুরুষের হৃদয় অত্যন্ত গভীর বিয়াস। বিশেষ করে বরাকরের। দামোদর বড় ভাল। শুধু ক্রোধ বেশী, তরঙ্গ বেশী, কিন্তু খোলা হৃদয়।

পাঁচেতের রিজরভয়র তখনও শেষ হয় নি। জল তখনও পুরো রাখা হত না।

জানত না বিপাশা, যে সুচতুর দিব্যেন্দু শুধু রঙ্গই করছে না। নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করছে।

আরও একটা প্রশ্ন সে করবে তাকে—জীবনে রঙ্গচ্ছলে যা করেছে তার সবই কি ব্যঙ্গ দিব্যেন্দু? হায়, জীবনকে কি এমনিভাবে নিজে হাতে ব্যর্থ করে?···

কিন্তু কোথায় দিব্যেন্দু?

দশাদিন পর কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে দাঁড়িয়ে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে, বিশ্বনাথের মন্দির-চূড়ার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—কোথায় দিব্যেন্দু? হে ভগবান!

মাইথনে মিত্তির এবং সেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভদ্রলোক তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। দিব্যেন্দুর কোয়ার্টার তার রেজিগনেশন পত্রের পর খালি করে, একটা গুদামে তার জিনিসপত্র এনে সেই দিনই রাখা হচ্ছিল। সেগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছিল। চিঠি-পত্রের সবই বন্ধু-দের চিঠি। প্রায় সকলেই এঞ্জিনীয়ার। কাজ করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে। বেনারসের দু-এক-জনের পত্রও ছিল। একটা আপিসের ফাইল ছিল। তার নিজের সঙ্গে আপিসের যে-সব বিনিময় হয়েছে—তার ফাইল। তার মধ্যে তার বেনারসের একটা ঠিকানা ছিল। আর কিচ্ছু না!

মিত্তির বলেছিলেন—তাই তো বিপাশা দেবী! এতে তো কিছু কিনারা হবে বলে মনে হয় না?

—একটা কাজ করে দিন আমার। বেশ ভেবেই সে বলেছিল।

—বলুন।

—রিপ্লাই পোস্টকার্ডে আপনি সকলকে একখানা করে চিঠি লিখুন। তারা যেন খোঁজ জানলে—আপনাকে জানায়। আর এই বিকেলেই আমাকে বরাকরের বিকেলের ডাউন ট্রেনটা ধরিয়ে দিন।

—সেখানে—

—ওখানে হেড অফিসে যদি কেউ কিছু জানে—খোঁজ করব। কলকাতায়ও খুঁজব। তার পর বেনারস আসব। বেনারসে খুঁজব।

—তারপর ?

—আর কি ? দশাশ্বমেধে মুক্তিস্নান করে চলব। যেমন একা চলছিলাম সংসার-পথে। মরতে মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু সে ঠিক হবে না। আশঙ্কাভরে মিত্তির তার দিকে তাকিয়েছিল, বলেছিল—না, না, সে তো এমন স্কাউণ্ড্রেল নয়—

সে ঘাড় নেড়ে একটু হেসেই বলেছিল—না। সে ভয় নেই। ধর্ম আমার অক্ষুণ্ণই আছে, মরতে মায়ের বারণ, মা বলে গেছেন—মরণা নেহি হ্যায়। মরবি শুধু তখন যখন ধরম যাবে। একটু থেমে বলেছিল—সেই তো মধ্যে মধ্যে সন্দেহ হচ্ছে—তাকে তো অদেয় আমার কিছুই ছিল না। কিন্তু সে তো কোনদিন সে সুযোগ নিতে চায় নি! আপনার মতন—ভিতর থেকে—। সে থেমে গেল—সংযত করে নিজেকে। এসব কেন বলছে সে? না। এ সংসারে একটি লোক ছাড়া এসব তো কাউকে বলতে পারে না সে। স্বামীজী! দিল্লীর স্বামীজী। আর একবার অমৃতসর গিয়ে খুঁজবে সে সর্দার হরদয়াল সিংজীকে, সব বলে বলবে—ফরমাইয়ে সর্দারজী, বলে দিন কি করব এখন? মরব? না বাঁচব?

আর একটা কাজ করেছিল মিত্তিরের পরামর্শে। পোস্টাপিসে লিখেছিল—তার চিঠিপত্র যেন মাইথনে মিঃ মিত্রকে দেওয়া হয়।

মিস্টার মিত্র তার আরও উপকার করেছিলেন—তার চেক নিয়ে তাকে টাকা দিয়েছিলেন।

কলকাতায় সে এর আগে দুবার এসেছিল—একবার ছাত্রীজীবনে, ছাত্রীদলের সঙ্গে দেখতে গিয়েছিল মহানগরী। দ্বিতীয়বার এই সেদিন, এসেছিল কর্মজীবনের তাগিদে। এসে উঠেছিল, আলিপুরে সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের একটি মেসে। অনেকটা ওই কনস্টিট্যিউশন হাউসের মতই তার কাঠামো। সেবার একটা অজুহাত করে দিব্যেন্দু সঙ্গে এসেছিল। সে উঠেছিল অন্যত্র, একটা হোটেলে। হোটেলগুলি খুব পরিচ্ছন্ন, আরামপ্রদ নয়, শৌখীন তো নয়ই; তবুও ভদ্র। কলেজ স্কোয়ারের কাছাকাছি। দিব্যেন্দুই বলেছিল—এসপ্ল্যানেডের বড় হোটেলের কথা বাদ দাও—ওখানে সাধ্য কি আমাদের মত অল্প প্রাণীরা ওঠে। কিন্তু ওর আশেপাশে হোটেল আছে। যেখানে আরাম আছে। খরচ বড় হোটেলের থেকে কম, কিন্তু পরিবেশটা ইণ্টারন্যাশন্যাল করবার দিকে ঝোঁক বেশী। বার আছে—রেস্টুরেণ্ট আছে—রাত্রি নটা নাগাদ অনেক দামী লোকের দেখা মেলে। থেলোয়াড়, চিত্রতারকা, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেইজন্যে ওদিক আর মাড়াই নে। এদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। এরা লোক ভাল। এইখানেই উঠি আমি।

সেবার দিবেন্দু ছিল পাঁচ দিন, সে ছিল ন দিন। দিব্যেন্দুর হোটেলে সে দুদিন এসেছিল সেবার। এবং দুদিন গিয়েছিল তারা বাংলা থিয়েটারে। দিল্লীর তালকোটরা গার্ডেনের অভিনয় দেখা চোখে, বাংলা থিয়েটারের শিল্প-সৌন্দর্যে, অভিনয়-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাকী কদিন, কোনদিন সন্ধ্যায় মেট্রোর সামনে—কোনদিন বিকেলে ডালহৌসি স্কোয়ারে দেখা হয়েছিল। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কাজ ছিল বিপাশার। সাড়ে চারটেতে বেরিয়েই সে তার দেখা পেয়েছিল।

পথে যেতে যেতে বলেছিল—তুমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলে, এত লোকের মধ্যে যদি আমি না দেখতে পেতাম, এবং তুমিও মিস করতে আমাকে।

সে বলেছিল—কি করব ? আপিসে সকাল-সকাল কাজ হয়ে গেল। বললে—কোল ফিল্ড এক্সপ্রেসে আজই যেতে পার তুমি। আমি অনেক কষ্টে কাটান দিয়েছি।

রাত্রেই কোন ট্রেনে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে দেখা হবার কথা সন্ধ্যেবেলা—তোমার মেসে। এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেসে ফিরতে দেব না তোমাকে। এখান থেকেই চল খানিকটা ঘুরে—তোমাকে পৌঁছে দিয়ে পাড়ি দেব রাত্রে। চল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল ঘুরে কালীঘাট মন্দির দেখিয়ে মেসে পৌঁছে দেব।

এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে সে-ই একদিন বলেছিল—কলকাতার এই একটি পয়েন্ট যেখানে দাঁড়ালে কলকাতার হারিয়ে-যাওয়া মানুষ মাসখানেকের মধ্যে চোখে তোমার পড়বেই।

এই হোটেলেই উঠেছিল বিপাশা। কিন্তু দিব্যেন্দুর খোঁজ পায়নি। সে এখানে আসেনি। ডি-ভি-সি হেড কোয়ার্টারে খোঁজ একটা পেয়েছিল—দিব্যেন্দু এসেছিল তিন সপ্তাহ আগে—শুধু পদত্যাগপত্র দাখিল করে চলে গেছে। কোন কথা বলে নি। কোন ঠিকানাও দেয় নি। দরখাস্তে ঠিকানা ছিল মাইথনের।

তবু সে কলকাতায় সাতদিন তাকে খুঁজেছে। হোটেলে হোটেলে ঘুরেছে, খোঁজ করেছে—দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি আছেন ? ফ্রম মাইথন ! টল, ডার্ক, রোবাস্ট ইয়ংম্যান !

বিকেল বেলাটা ওই এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে থেকেছে !

কিন্তু কোথায় দিব্যেন্দু ?

সাত দিন পর সে এসেছিল বেনারস। আপিসে সংগ্রহ করা ঠিকানা বের করে তার খোঁজ করেছিল। কিন্তু সে তো ভাড়ার বাড়ি। আশেপাশে পুরনো বাসিন্দের কাছে খোঁজ করেও কিছু পায় নি। দিব্যেন্দুর সন্ধান ঠিক নয়—তার অতীত কথা। তার দিদিমা এবং তাকেই কয়েকজন মনে করতে পারলেন—কিন্তু সে ওই মনে করাই। তার বেশি কিছু নয়। তারা কাশীতেই পূর্বে অন্য ঠিকানায় থাকত, দাদামশায়ের মৃত্যুর পর এখানে এসেছিল—কম ভাড়ার বাসায়। ছেলেটি—সত্যিই ভাল ছেলে ছিল। কিন্তু ইদানীং তো সে আসেনি ! কাশীর সে দু-তিনজনের চিঠি পেয়েছিল দিব্যেন্দুর বাসায়, তারা বললে—দিব্যেন্দু ! কই না তো ! সে তো আসে নি ! কিন্তু আপনি—? আপনি কে ? তাকে খুঁজছেন ?

সে বলেছিল—তাকে আমার অত্যন্ত প্রয়োজন !

ঘুরিয়ে বলেছিল।

সকাল সন্ধ্যায় গিয়ে বসে থাকত দশাশ্বমেধের ঘাটে। ভোর বেলা থেকে পুরনো বাসার ঠিকানায় গিয়েছিল। স্থানটায় অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার লোকে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে আছে বাসিন্দার মত। তারা মনে করতে পেরেছিল : দাদামশায়—মুখুজ্যেমশাই পেনসন পেতেন। চুরোট খেতেন, গিন্নী বড্ড বকতেন। মেয়েটি বিধবা হয়ে কেমন হয়ে গিয়েছিল। ছেলে দেখত না। সধবা সেজে থাকত। কারুর সঙ্গে কথা বলত না। মাথায় বিকৃতি ঘটেছিল। তীর্থে গিয়ে মারা গিয়েছিল। ছেলেটি বড় ভাল ছিল। বড় দুর্দান্ত, কিন্তু প্রাণবন্ত। এর বেশী কিছু নয়।

যে প্রেসে সে প্রুফ দেখত—সেখানেও গিয়েছিল।

সেখানেও সেই এক কথা।—হ্যাঁ, ছিল। কাশীতে থাকতেন দাদামশায় দিদিমা, তাদের কাছেই মানুষ হয়েছিল। মায়ের মৃত্যুটা শোচনীয়। সম্ভবত সুইসাইড। মাথা খারাপ ছিল তাঁর। সঠিক তো বলতে পারব না।

নীলকণ্ঠ বিশ্বনাথের কাশী। এখানে যত বিষ সব কিছুকে আশ্রয় দেন—বিশ্বনাথ। অথবা কাশীর সমাজ। পাতিত্য নিয়ে এখানে মন্থন করে না কেউ।

কাশীতে পঞ্চম দিন—সেদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে সে উঠে দাঁড়াল।

কোথায় দিব্যেন্দু?

দিব্যেন্দু কোন অন্ধকারে বা কোন অজ্ঞাতস্থানে গিয়ে আবার খুঁজছে কোন নূতন নায়িকাকে।

তুমি সত্যই অনার্য দিব্যেন্দু—

বাইরের দেহবর্ণটা কৃষ্ণবর্ণ হলেই অনার্য হয় না। অন্তরটাও কালো। সত্যই তুমি অনার্য।

দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করে কাল বিপাশা তোমার স্মৃতি নিঃশেষে ধুয়ে মুছে ফেলে মুক্তির জীবন নিয়ে ফিরবে।

ফিরল সে—হোটেলে। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই হোটেল।

পরদিন তাই সে করল। দশাশ্বমেধে স্নান করে মনে মনে বললে—এই গঙ্গার স্রোতে তোমার সব আমি ভাসিয়ে দিলাম। নীলকণ্ঠের কণ্ঠে থাকুক আমার মনের দুঃখ বেদনা। বিকেলে বরাকরের টিকিট কেটে সে ট্রেনে চাপল।

কিন্তু নীলকণ্ঠেরও বোধহয় এতকালের মানুষের জীবন মন্থন করা বিষ সহ্য হয় নি, তাঁরও বোধহয় এ বিষে মৃত্যুর কাছে পরাজয় ঘটেছে। এতকাল পরে বিষের ক্রিয়ায় সত্যই পাথর হয়ে গেছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয়েছে। অথবা তাঁর কণ্ঠে আর স্থান নেই। বিপাশার মনের বেদনা, স্মৃতি কিছুই তিনি নিতে পারেন নি। ট্রেনের গতির সঙ্গে অনুভব করলে বিপাশা সে বেদনা, স্মৃতি, কলকাতা কাশী দু-জায়গায় অনুসন্ধানের ব্যর্থতায় হাহাকার করছে। মধ্যে মধ্যে মাথায় যেন আগুন জ্বলছে, বুক জ্বলছে।

পাঞ্জাবের শর্মা বংশের বিচিত্র যে মেয়েরা বিষ খেয়ে মরেছে, বুকে ছুরি বসিয়েছে, বাপের অস্ত্রের তলায় গলা পেতে দিয়েছে, কাপড়ে আগুন ধরিয়ে পুড়ে শুভ্রবর্ণকে কালো করে মরণের মুখে ঢলেছে, যে মেয়ে অপহরণকারী শক্তিমানের বুকে পিঙ্গল চুলের খোঁপায় লুকানো সোনায় বা রূপোয় মোড়া হৃৎপিণ্ডভেদী ইস্পাতের কাঁটা বসিয়ে দিয়েছে—সেই মেয়ে যেন ওই আগুনের আঁচে জাগছে।

একসময় মনে হল—গভীর রাত্রে এই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটন্ত মেলটা থেকে সে পড়বে? ঝাঁপ দিয়ে পড়বে? মরবে? কি হবে বিষাক্ত জীবন রেখে। এ বিষজর্জরতা তো গেল না। গঙ্গার জলে ধুয়ে গেল না, দশাশ্বমেধের পুণ্যে না, নীলকণ্ঠের প্রসাদে না। তবে?

না তাকে না-মেরে নয়।

হ্যাঁ। না, তাকে মেরে তবে সে মরবে।

মরণা হ্যায় তো পহেলে মারণা হ্যায়। লড়না হ্যায়, মারণা হ্যায়—তব মরণা হ্যায়।

বরাকরে নামল সে শেষ রাত্রে। তুন এক্সপ্রেস। রাত্রি আড়াইটে। বাকী রাত্রিটা সে ওয়েটিং-রুমে কাটিয়ে ভোরবেলা ট্যাক্সি করে এল বাসায়।

চুড়কি তাকে দেখে সভয়ে পিছিয়ে গেল।—ও মা!

—কি? বুঝতে পারে নি সে।

চুড়কি এবার বললে—ভয় লাগছে তুমাকে দেখে।

তার নিজের দৃষ্টি পড়ল এবার আয়নার দিকে। দেওয়াল ঘেঁষে রাখা টেবিলের উপরকার আয়নাটা ছোট নয়।

প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা তার মুখে চোখে—তার বিশৃঙ্খল স্বর্ণাভ—না স্বর্ণাভ নয়, পিঙ্গলবর্ণ চুলে যেন উন্মাদের ছোপ বুলিয়ে দিয়েছে!

সে কি পাগল হয়ে যাবে? হে ভগবান! সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল নিজেকে।

চুড়কি এগিয়ে গেল। টেবিলের সামনে দাঁড়াল।

সে অসহিষ্ণু ক্রোধে বললে—কি? ওখানে কি? দাঁড়ালি কেন আড়াল করে?

চুড়কি টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে একটা বড় লম্বা খামের প্যাকেট বের করে বললে—ইটো—আপিসের চিঠি, কাগজ—! সে দ্রুতপদে গিয়ে হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে!

চুড়কি বললে—মিত্তির সাহেব পরশু দিয়ে গেল যি। রেজেষ্টালী—। বুললে দিবু সাহেবের চিঠি—

—কার?

—সেই আমাদের সাহেবের—

—কার? ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিল সে। হ্যাঁ। রেজেস্ট্রি করা লম্বা খামের চিঠি। দিবোন্দু চ্যাটার্জি,—কেয়ার অফ—পোস্টমাস্টার, এলাহাবাদ।

বুকের মধ্যে যেন হৃৎপিণ্ড মাথা কুটছে। ফেটে যেতে চাচ্ছে।

কম্পিত হাতে সে খুলে ফেললে খামটা।

দীর্ঘ পত্র।

সাত

দীর্ঘ পত্র। সম্বোধনহীন।

"কোন্ সম্বোধনে আপনাকে সম্বোধন করতে পারি জানি না। বোধ হয় কোন সম্বোধনেই আমার অধিকার নেই। 'তুমি'ও আমি বলতে পারি না। আপনার পবিত্র নাম বিপাশা দেবী বলেই শুরু করছি। 'বিয়াস' বলবারও অধিকার নেই। কারণ সংসারে প্রেম প্রীতি স্নেহ শ্রদ্ধা যাই আমার জীবনপাত্রে পড়বে, তাই-ই আমার কলঙ্কবিষ-বিষাক্ত জীবনপাত্রে পড়েই নীল হয়ে যাবে

বিষে। কলঙ্কিত জীবনপাত্র আমার। বিপাশা দেবী, আমি আমার মাতাপিতার বিবাহিত জীবনের পুণ্যফল নই, আমি তাঁদের গোপন পাপ, ব্যভিচারের ফল। আমি অবৈধভাবে উৎপন্ন—জারজ!

আমার মা নিজে আদালতে দাঁড়িয়ে এই কথা সাক্ষী হিসাবে বলে গেছেন।

বিপাশা দেবী, দাসী জবালার পুত্র সত্যকাম। দাসী জবালাও পুত্রকে এমনি কথাই বলেছিল—কিন্তু সে ছিল দাসী। সে ছিল জন্ম হতে সেদিনের সমাজ-নির্দেশ অনুযায়ী প্রভুর ভোগ্যা। সমাজের অবিচারে, নির্যাতিতার সে-দিন এই ছিল ভাগ্য; তাকেই বিধিবিধান মনে করে, অন্ন-কাঙালিনী, আশ্রয়-কাঙালিনী, জবালা যেদিন বলেছিল—বহু পরিচর্যার মধ্যে তুমি এসেছ আমার গর্ভে, আমার কোলে, সেদিন তাঁর সত্যভাষণে সত্যকাম লজ্জিত হয় নি। তার জননীর সঙ্গে সঙ্গে তার জন্মের মধ্যে পাপ বা কলঙ্ক বড় হয়ে ওঠে নি। সেদিন দাসীপ্রথার সঙ্গে প্রভুর দাসী রাখার অধিকার ছিল। আজ দাসীপ্রথা নাই, পাপ বলেই উঠে গেছে। আজ ও-কথা বলতে সত্যকামও থমকে দাঁড়াতেন। আজও বেশ্যাপুত্র হয়ে শিক্ষা লাভ করে যদি মানুষ হতাম—তবে বলতে পারতাম—সত্যকামের মতই অসঙ্কোচে বলতে পারতাম— আমার জন্মকথা এই। বেশ্যাপুত্র জারজ নয়, তার পরিচয় সে বেশ্যাপুত্র। পৃথিবীতে জন্ম তার অবৈধ নয়, ওই তার বৈধ জন্ম। বেশ্যারা তো ভ্রূণ হত্যা করে না।

আজকের সমাজে যে-সব নবজাতকের। রাত্রির অন্ধকারে পথপ্রান্তে অথবা আবর্জনাস্তূপে অথবা নরকের মত কদর্য দুর্গন্ধময় মানুষের অগম্য স্থানে, মৃত হয়ে নিক্ষিপ্ত হয়, তারাই অবৈধ, তারাই জারজ। আইনগতভাবে রাজ্যে তাদের স্থান হয়তো আছে, কিন্তু মানুষের মনের রাজ্যে, স্নেহ-প্রীতির রাজ্যে তাদের স্থান নেই। শ্রদ্ধা সম্মান প্রেমের রাজ্যে তো—নেই—নেই—নেই।

জারজ কথাটা উচ্চারণ করুন—দেহ মন একটা অস্বস্তি অনুভব করবে। ঘৃণায় শিউরে উঠবেন। আমি অনুভব করছি জ্বালা। সমস্ত দেহে মনে নিষ্ঠুর একটা দাহ-যন্ত্রণা। মৃত্যু-প্রদাহের মত।

পৃথিবীর সকল দেশেই আমার মত যারা, তারা এ জ্বালা অনুভব করে। এ সর্বজনীন সত্য। আমার মা, সৎ সম্ভ্রান্ত পিতামাতার সন্তান, মাতামহ ছিলেন গেজেটেড অফিসার—লেখাপড়া শিখেছিলেন, গান জানতেন, শান্তিনিকেতনে নাকি পড়েছিলেন কিছুদিন। অন্নের অভাব ছিল না—বস্ত্রের না, দাসীর পরাধীনতায় আবদ্ধ ছিলেন না—তবে? আমার বাবা, তিনিও তাই। মায়ের সঙ্গে যখন পরিচয় হয়, তখন শিবপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করে বেরিয়েছেন, বিলাত যাবেন, শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়—না, তাঁর তো দায়িত্ব নাই, মা-ই তাঁকে প্রতারণা করেছিলেন। আদালতে এই-ই আমার মায়ের স্বীকৃতি। শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় আদালতে দাঁড়িয়ে আমার মায়ের সাক্ষ্য নীরবে স্বীকার করেছেন। তাঁরা বিবাহ করেন নি, কিছুদিন লালসা-বশে, এক মাস—মিলিত হয়েছিলেন মাত্র। পশু এবং পশুনারীর মত। তারপর মা ফিরে আসেন পিতৃগৃহে—তিনি চলে যান বিলেত। আমার জন্মের পর তিনি বিলেত থেকেই অস্বীকার করেন—আমার জন্মের দায়িত্ব। কারণ আমার জন্মের মাস থেকে—আমার—।

যাক।

আমার বুকে সর্বনাশের আগুন জ্বলছে, সেই প্রদাহে আমি সকল সহ্যশক্তির সীমা অতিক্রম

করে আর্ত চিৎকারে বিলাপ করছি। কিন্তু এ বিলাপ অশুচি, এ বিলাপ কুৎসিত, এ বিলাপ পাপ। আমি জানি আপনি অন্তরে অন্তরে পীড়িত হবেন। হওয়াই স্বাভাবিক। এ আমার লেখা উচিত নয়। তবু লিখছি—আজ সপ্তাহ দুয়েক উন্মাদের মত বিনিদ্র রাত্রি জেগেছি—আপন মনে প্রলাপ বকেছি, চিঠি লিখে ছিঁড়েছি—আবার লিখেছি—আত্মহত্যা করতে গিয়ে মাকে খুঁজবার জন্যে আর আপনাকে এই পত্র লেখার জন্যে নিরস্ত হয়েছি। আমি এই সত্য জানতাম না বিপাশা দেবী। এক মাস আগে পর্যন্তও জানতাম না। বাল্যকাল থেকে যদি জানতাম তবে নিশ্চয় এ জ্বালা এ যন্ত্রণা অনুভব করতাম না। সংসারে এমন শিশু কম নয়; তাদের জন্য অনাথ আশ্রম আছে। আবার অনেক শিশু আছে—যারা সংসারে থেকেও জেনেছে—মনে মনে সয়ে গেছে তাদের। আজ এই নিষ্ঠুর মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে মনে হচ্ছে যে, হয়তো সত্যকাম বাল্যাবধি তার মায়ের ভর্তৃহীন সংসারের আবেষ্টনীর মধ্যে বেড়ে ওঠার ফলেই এই সত্যের আভাস পেয়েছিল—মনে মনে এটা সহ্য হয়েছিল—তার উপর অবশ্যই তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ সত্যকাম, তাই বলাটাও সহজ হয়েছিল। জীবনে মর্মদাহী কোন যন্ত্রণা তাঁর আসে নি।

এ সত্য আমি জানতাম না। জানলে হয় আপনার অন্তরঙ্গ হতে চাইতাম না অথবা আপনার অমৃতের মত মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনে মৃত্যুর মত বিষের জ্বালা সঞ্চারিত করে—পৈশাচিক উল্লাসে উল্লসিত হতাম। আমি জানতাম না—তাই বোধহয় সেই পাপ পাশব সত্তার জাগরণ আমার মধ্যে হয় নি। সত্তারও জাগরণ আছে। শক্তির মত। লড়াইয়ে না নামলে যেমন শক্তির জাগরণ হয় না, তেমনিই বোধহয় এরও জাগরণ হয় নি। আমি সতী ভদ্রনারীর সন্তান—সৎ উচ্চশিক্ষিত মানুষ আমার জন্মদাতা—এই বিশ্বাসের শৃঙ্খলে বাঁধা নররক্ত-পিপাসু শ্বাপদ-শিশুর মত শৈশব থেকে মানুষের শিশুর সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে খেলা করেছি—মানুষের ধর্মে। আজ যেদিন থেকে জেনেছি—সেদিন থেকে চকিতে চকিতে যেন এর জাগরণের চমক অনুভব করব কল্পনা করছি। তার আগেই চিঠি লিখছি এবং তার আগেই আমার এ পাপ জীবন শক্তিকে—। থাক, পরে অবশ্য সে সংবাদ পাবেন।

আমি জানতাম আমার জনক পবিত্র—আমি পবিত্র—এই পবিত্র মানুষের সমাজকে শুধু আমার কর্ম দিয়ে নয়, পবিত্রতা দিয়ে সমৃদ্ধ করে সার্থক হব। আপনার সঙ্গে দেখা হল। মনে হল মূর্তিমতী পবিত্রতা আপনি। আপনার কাহিনী শুনলাম—মহাদুর্যোগের মধ্যে পাপের ভয়ঙ্কর আক্রমণকে প্রতিহত করে অন্ধকারের মধ্যে অকম্পিত আলোক-শিখার মত আপনি পার হয়ে এসেছেন। আপনাদের বংশ আপনার এই রূপের আকস্মিক আবির্ভাবের এবং তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার কথা শুনে সাধ হয়েছিল—আপনার সঙ্গে জীবনকে যুক্ত করব। এতে এতটুকু কোন মলিনতা ছিল না, কলুষ ছিল না। আপনি শুচিশুভ্র, তা থাকলে আপনি নিশ্চয় অনুভব করতেন।

আপনি জানেন—আমার দাদামশাই মামাদের বঞ্চিত করে আমাকে সব উইল করে দিয়েছিলেন। উইলটা নিতান্তই একটা ছুতো। কারণ, দেবার মত তো কিছু ছিল না। ইনসিওরেন্সের টাকার অবশিষ্ট—সে পেয়েছিলেন দিদিমা। সেটাও উইলে ছিল। থাকবার মধ্যে তার

দেশ হুগলী জেলায় ছিল—একটা সরীকানি দেবত্রে অংশ। সামান্য। দেবসেবা চালাতে হত। তার জন্য ছিল কিছু এজমালী, যার বছরে আয় ছিল দাদামশায়ের অংশে তিনশো টাকা। দেবসেবায় তিনি কিছু দিতেনও না, নিতেনও না। সরীকদের সঙ্গে ওইটেই ব্যবস্থা ছিল। ওটাই তিনি আমাকে উইল করে দিয়েছিলেন—মামাদের বঞ্চিত করে। উইল রেজেস্ট্রী করে গিয়েছিলেন। আমাকে কিছু করতে হয় নি। আমি শুধু হেসেছিলাম। কারণ শূন্য দান আর শূন্য গ্রহণ, এতে হাসি ছাড়া আর কি আছে। মামাদের নিষ্ঠুর কথায় কেঁদেছিলাম। জানি না আপনাকে বলেছি কি না সে কথা। দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁরা যখন কাশী এসেছিলেন বাপের শ্রাদ্ধ করতে, তখন তাদের অশৌচ অবস্থায় আমি জল দিয়েছিলাম, কিন্তু সে জল ফেলে দিয়ে তাঁরা আমাকে বলেছিলেন—পাপ কোথাকার! এ দুটোই সেদিন আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়েছিল। কিন্তু ওই দাদামশাই শূন্যোপম সম্পদ আমাকে উইল করে দিয়ে আমার জন্ম বৈধ করতে চেয়েছিলেন দৈহিত্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে—তা সেদিন বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, এটার মধ্যে আছে পুত্রদের প্রতি অপমান মাত্র। সুতরাং ও নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। দেবসেবায় টাকা খরচ হয় সেই পর্যন্ত। কোনদিন কোন খোঁজও করি নি।

মাস দেড়েক কি প্রায় মাস দুয়েক আগে হঠাৎ একটা নোটিশ এল। সেটেলমেণ্ট বিভাগের নোটিশ। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে—জমিদারী থাকবে না, তার আগে জরীপ হচ্ছে। জমিদারী রাষ্ট্রসম্পত্তি হবে। জমিদারেরা ক্ষতিপূরণ পাবেন। তিনশো টাকা আয়—সেখানে ছ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাবার কথা। আমি সরীকদেরই লিখলাম—আপনারা চিরকাল সব করে আসছেন, আপনারাই করবেন। লেখাবেন আমার নাম। নির্ভর আপনাদের উপরেই করলাম! কিছু টাকাও পাঠিয়ে দিলাম। কারণ সেটেলমেণ্ট বিভাগের দুর্নীতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় অনেক প্রশ্নোত্তর হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে চিঠি পেলাম, আমার মামারা আপত্তি দিয়েছেন—সম্পত্তির মালিক তাঁরা। দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় নয়।

মনে মনে হেসেছিলাম। বাৎসরিক তিনশো টাকা আয় এবং তিনশো টাকা ব্যয় যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ এর উপর কোন দাবী তাঁদের ছিল না। এবার নগদ মূল্য ছ হাজার। দেবতাদের ক্রেম দেবতারা দেখবেন—সেবাইতরাই টাকাটা যখন হাতে পাবেন তখন মামারা আর উদাসীন থাকতে পারেন নি। আমার লোভ ছিল না। ঠিকানা জানতাম না, না হলে লিখতাম—আমি কোন দাবী করব না, আপনারাই নেবেন টাকা।

হঠাৎ এমনই সময় মামারা সত্যকে উলঙ্গ করে আমার সামনে ধরলেন। রেজেস্ট্রী চিঠি এল। হাসতে হাসতেই খুলেছিলাম। কিন্তু মুহূর্তে হাসি ফুরিয়ে গেল, দিনের আলো যেন নিভে গেল, বায়ুস্তর শ্বাসরোধী হল। পৃথিবীর শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। ওঃ, মনে হল, মাথায় আমার বজ্রাঘাত হয়েছে। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, আমিও বর্ণনা করতে পারব না সেই ক্ষণটুকু!

চিঠি নয়—আমার মৃত্যু-পরোয়ানা।

দিব্যেন্দু, তুমি আমাদের সহোদরা লাবণ্যপ্রভার গর্ভজাত পুত্র; কিন্তু বৈধ সন্তান নও, তুমি

তাহার অবৈধ সন্তান। বাবা এবং মা তাঁহাদের অন্ধস্নেহে তোমাকে পালন করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা তাঁহাদের সহিত সংস্রব রাখি নাই। কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকার তিনি তোমাকে দিয়া গেলেও তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না।

তুমি সকল বিষয় অবগত আছ কিনা জানি না। বাবা-মা এ বিষয়ে বরাবরই সমস্ত চাপা দিয়া আসিয়াছেন। তোমার কাছেও চাপা রাখিয়া থাকিতে পারেন। লাবণ্যের প্রতি অন্ধ স্নেহে তাহার সকল উচ্ছৃঙ্খলতা এবং পাপের হেতু তাঁহারাই। সুতরাং তুমি না জানিলেও না জানিতে পার। কিন্তু আমাদের কাছে প্রমাণ প্রয়োগ সবই আছে।

তোমার বাবা শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় তোমার জন্মের পর বিলাত হইতে যে পত্র লেখে সে পত্র আমাদের কাছে আছে। তাহাতে সে তোমার পিতৃত্ব অস্বীকার করিয়াছে।

তাহার পর এলাহাবাদ কোর্টে—১৯৩৫ সালে মিসেস এলিস চ্যাটার্জির সঙ্গে শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের যে প্রতারণার ও ডাইভোর্সের মামলা হয়, তাহাতে তোমার মা ইহা স্বীকার করিয়াছেন—তাহার নথিপত্রও আমাদের কাছে আছে। তিনিও সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াছেন। এখন এই সকল প্রমাণ প্রয়োগ সেটেলমেণ্ট আদালতে উপস্থিত করিয়া বা অন্য আদালতে উপস্থিত করিয়া আমাদের বংশের তোমার মায়ের, বিশেষ করিয়া তোমার মুখে প্রকাশ্যভাবে কলঙ্ক লেপন করা আমাদের অভিপ্রায় নয়। কিন্তু তুমি বাধ্য করিলে অবশ্যই আমরা বাধ্য হইব। ইহা জানিয়া যাহা অভিপ্রায় আমাদের জানাইবে। অর্থাৎ তোমাকে নিজে হইতে স্বীকার করিয়া দরখাস্ত করিতে বলিতেছি—সেটেলমেণ্ট আদালতে যে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তোমার মাতুলেরা। তুমি নও। ইতি—

মনে পড়ছে বিপাশা দেবী, স্পষ্ট এই মুহূর্তটা মনে পড়ছে। ফ্যাক্টরীতে ভোঁ বাজবার সময়। মাইথনের চারিপাশে কলিয়ারীতে ফায়ার ব্রিক্স ফ্যাক্টরীতে ভোঁ বাজতে লেগেছিল। মনে হয়েছিল হো—হো—শব্দ করে তারা দুনিয়ার সমাজকে ডাকছে। শোন—হো—।

আমি পাগলের মত চিৎকার করে উঠেছিলাম—না-না। আমার মনে আছে। নিজের ছোট ঘরটার মধ্যে ঘটেছিল সবটা, নইলে সহকর্মীরা সচকিত এবং বিস্মিত হতেন। শুধু বেয়ারাটা ছুটে এসেছিল। সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। আমি তাকে ইঙ্গিতে চলে যেতে বলেছিলাম।

* * *

বিপাশা দেবী, চোরের সন্তান—খুনীর সন্তান—এমন কি অক্ষম মানুষের সন্তান নিজের যোগ্যতার যত উচ্চ বেদীতেই দাঁড়িয়ে থাক—পিতাকে যখন স্মরণ করে তখন লজ্জা হয়, মাথা আপনি নীচু হয়ে আসে—তাও যদি না আসে তবে চিত্ত অপ্রসন্ন হয়, এ সত্য নিঃসন্দেহ। কিন্তু মা যেখানে নির্দোষ—সেই তার পুণ্যের আধার সান্ত্বনার আশ্রয়। সেই মুহূর্তেই আমার কি মনে হয়েছিল জানেন? আমার মাতা পিতা দুজনেই মনুষ্যত্বকে খোলসের মত পরিত্যাগ করে শিল্যুট ছবির মত সেই ঘরখানার দুই কোণে দাঁড়িয়ে কদর্য হাস্য করে উঠেছিল। সভয়ে আমি চোখ মুদেছিলাম।

দীর্ঘক্ষণ—বোধহয় ঘণ্টাখানেক পর ভেবেছিলাম মাইথন ড্যামের উপর থেকে রাত্রির অন্ধকারে

গলায় পাথর বেঁধে ঝাঁপ খাব।

মাথা ধুয়ে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকতে হঠাৎ মনে হয়েছিল—মামারা যে সত্য বলছে তার প্রমাণ কি? এদের তো জানি। নিজেদের মায়ের সঙ্গে এদের ব্যবহার দেখেছি। সম্পত্তি সম্পদ কিছু ছিল না বলে মাতৃশ্রাদ্ধ করে নি। সেদিন সেই সম্পত্তির মূল্য ছিল না বলে—সেদিন এ সত্যের প্রকাশ হওয়া উচিত বলে মনে করে নি। আজ বিচিত্র ভাবে এর মূল্য ছ'হাজার টাকায় পরিণত হয়েছে বলে—এই সত্যকে প্রকাশ করতে চান। এঁদের বিশ্বাস কি?

মন—আশাকে আঁকড়ে ধরে কল্পনা শুরু করলে। সে কত কল্পনা শুরু করলে। সে কত কল্পনা! কল্পনায় মামাদের নিষ্ঠুর অপমান করলাম। তারা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন—ক্ষমা করো দিব্যেন্দু! ক্ষমা করো। যদি ভয়ে ওটা ছেড়ে দাও—তাই এমন মিথ্যা লিখেছিলাম। মামাদের অনেক অভাব। আমি কল্পনা করলাম—আদালতে আমিই থাকব এর উত্তরাধিকারী। তবে এ অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। দিয়ে দেবো তোমাদের।

ছোটমামা, যিনি তেল কোম্পানিতে কাজ করতেন—তিনি তখন কলকাতায় ছিলেন। চিঠিতে বাসার ঠিকানা ছিল তাঁরই।

টেনে নিলাম একখানা কাগজ। ছুটির দরখাস্ত লিখলাম। পারিবারিক গুরুতর আকস্মিক প্রয়োজনে আমি ছুটি চাই।

দরখাস্তখানা সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাছে দিয়েই আমি বললাম—আমার না গিয়ে উপায় নেই। আমি যাচ্ছি। এই আধঘণ্টার মধ্যেই ট্রেন। এই ট্রেনেই আমি যাব।

চলে এসে—আমি একটা ছোট ব্যাগে জিনিসপত্র এবং যা টাকা ছিল তাই নিয়ে স্কুটারে চেপে চলে গেলাম, ট্রেন ধরতে পারি নি। আসানসোলে ট্রেন ধরেছিলাম। স্কুটারখানা আসানসোল স্টেশনে একজন পরিচিত কর্মচারীর কাছে রেখে দিলাম।

ভোরবেলা হাওড়া পৌঁছেছিলাম।

স্টেশনেই হাতমুখ ধুয়ে সরাসরি গিয়ে উঠেছিলাম মামার ঠিকানায়। তিনি আমাকে তার প্রথম যৌবনে দেখেছিলেন। তখন কৈশোর সবে অতিক্রম করছি। তার সঙ্গে এখনকার আমার আকারের, রূপের তফাৎ হয়েছে। তার উপর আমার চোখে মুখে, অন্তরের বহ্নিদাহের ছাপ ফুটে উঠেছে। আমার কালো মুখে চোখের শুভ্রাচ্ছদে রক্তের আভাস ফুটে উঠেছে। দরজা খুলে আমাকে দেখেই তিনি ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে। আমি বলেছিলাম—আমি দিব্যেন্দু! তিনি বলেছিলেন—হ্যাঁ।

আমি সরাসরি বলেছিলাম—কি প্রমাণ আপনাদের আছে, দেখতে এসেছি। যদি সত্য হয়—প্রমাণ পাই, তা হলে যা বলেছেন—লিখে দিয়ে চলে যাব। না পেলে এই নিষ্ঠুর মিথ্যার শাস্তি আমি নিজের হাতে দিয়ে যাব।

মাথার মধ্যে যে আগুন জ্বলছিল, তার উদ্গীরণ সেই মুহূর্তে চেপে রাখা—আমার পক্ষে সম্ভব-পর হয় নি। আমি বলেছিলাম—আপনাদের রক্তের ঋণ আমি আজ শোধ করব। আমার মা যদি

নির্দোষ হন, যদি অভিযোগ মিথ্যে হয়, তবে—তবে আপনাদের খুন করে ফাঁসি যাব। যদি অভিযোগ সত্য হয়, যদি আমার মা—। আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। বলতে চেয়েছিলাম, আত্ম-হত্যা করে এ রক্ত-ঋণ শোধ করব।

মামা নিজের বাড়িতে দাঁড়িয়ে ছিলেন—এবং প্রকৃতিতেও নিষ্ঠুর নির্মম তিনি, সেই হেতুই বোধহয় অবিচলিত থাকতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন—বস। প্রমাণ দেব বৈকি। প্রমাণ না থাকলে—এতবড় অভিযোগ কি কেউ নিজের সহোদরার উপর আনতে পারে? এ নিয়েই আমাদের সঙ্গে বাবা-মায়ের বিরোধ সেই গোড়া থেকে। বস।

—না। বসতে আমি আসি নি।

—বসতে একটু হবে। কারণ প্রমাণগুলি দেখতে হবে। বস। বলে আলমারি খুলে একটি পরিষ্কার কাপড়ে বাঁধা কতকগুলি কাগজ বের করেছিলেন। একটি দপ্তর। দপ্তর খুলে আদালতের ছাপ মারা আদালত-সম্মত স্ট্যাম্প কাগজে টাইপ-করা একটি নথি বের করে আমার হাতে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ছিঁড়ো না। অবশ্য আরও কপি একটা আছে দাদার কাছে।

আমি দেখছিলাম নথিটা। মাথার মধ্যে যে আগুন জ্বলছিল—সেও যেন ক্ষণিকের জন্য স্থির বা স্তব্ধ হয়েছে।

এলাহাবাদ কোর্টের—১৯৩৫ সালের ফৌজদারী আদালতের নথি। মিসেস এলিস চ্যাটার্জি বনাম শরদিন্দু চ্যাটার্জি।

মামা বললেন—ওটা রাখো। আগে এটা দেখো। শরদিন্দুর পত্র। সে বিলেত থেকে লিখেছিল। পত্রের ফটোস্টাট কপি।

তারও আগে—শোন—ঘটনা যা ঘটেছিল। আমাদের বিশ্বাস তুমি জান না। বাবা বা মা তোমাকে বলেন নি। বলা সম্ভবপর ছিল না। জানলে তুমিও এমনভাবে রুদ্র মূর্তিতে এসে খুন করব বা খুন হব বলে ব্র্যাভাডো করতে না।

লাবণ্য আমাদের দুই ভাইয়ের অনেক দিন পর জন্মেছিল। বোধহয় ছ'বছর পর। বাবা ছিলেন—প্রথম দিকটায় সত্যিকারের এলিট। আমাদের দুই ভাইকে তৈরী করেছিলেন সেই ভাবে। সাহেবদের ইস্কুলে পড়েছি, সেই শিক্ষায় বড় হয়েছি। একসময় লোকেরা নিন্দে করত। অনেকে বলত ক্রীশ্চান। অনেকে বলত—ব্রাহ্ম। মা অনেক ঝড় তুলেছেন—তুলতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বাবাকে টলাতে পারেন নি। এবং আমরাও ছিলাম বাবার ডান হাত বাঁ হাতের মত। তারপর বাবা ট্রান্সফার হলেন বীরভূম। বোলপুর। লাবণ্য তখন আট বছরের। দেখতে সুশ্রী ছিল। অত্যন্ত সুশ্রী। সুন্দরী বলতো লোকে। কিন্তু—? থাক—। বাবা পড়লেন শান্তিনিকেতনের ইনফ্লুয়েন্সে। রবীন্দ্রনাথের তখন বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তার উপর বীরভূম বামাক্ষ্যাপার দেশ। বোলপুরের কাছেই কঙ্কালীতলা। বাবা ওই সব ইনফ্লুয়েন্সে পড়ে পাল্টালেন। খাওয়ায়-দাওয়ায় চাল-চলনে। প্রাচীন ভারত-বিধি-বিধান চালাবেন। উই ফট। আমরা লড়াই করেছিলাম। কিন্তু কি করব। আমরা ছিলাম তাঁর মুখাপেক্ষী। রোজগার তাঁর। বীরভূমেই বাবা ছিলেন আট বছর। নাইন্‌টিন টুয়েন্টি থেকে নাইন্‌টিন টুয়েন্টিসেভেন। বোলপুর, সিউড়ি, রামপুরহাট। লাবণ্যকে পড়তে দিয়েছিলেন

শান্তিনিকেতনে। সে হয়ে উঠল বিচিত্র জীব। রোমান্টিক এবং উচ্ছৃঙ্খল। অবশ্য আমি উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য শান্তিনিকেতনের শিক্ষাকে দায়ী করি নে—এটা ছিল তার চরিত্রে। বাবা-মায়ের আদরে তা প্রশ্রয় পেয়েছিল। ইয়েস। প্রশ্রয় পেয়েছিল। তার উপর বাবারও হল ডিগ্রিতে ডিগ্রিতে ধর্ম-জগতে প্রমোশন। তিনি হলেন কীর্তন-ভক্ত। বৈষ্ণবপ্রেম। আমার মাদারের জয়-জয়কার। লাবণ্য গান গাইত বড় ভাল। তাকে বাবা কীর্তন শেখাতে লাগলেন। গানের মাস্টার রাখলেন। আমরা আপত্তি করেছিলাম। এ কি করছেন? বাবা বলতেন—অয়েল ইওর ওন মেশিন বয়েজ। তাঁর সঙ্গে ঝগড়া তখন আমাদের শুরু হয়েছে। আমরা বিয়ে করেছি। চাকরি করছি। আমাদের দুই ভাই-ই ইংরেজী মতে চলি। পছন্দ করেই বিয়ে করেছিলাম। ঝগড়াটা আমাদের সেখান থেকেই শুরু। অবশ্য লাবণ্যের শিক্ষা নিয়ে ঝগড়া তার আগে থেকেই ছিল। এবং লাবণ্যের চালচলন এবং বাবা-মার তাকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দেওয়া দুটোতেই আমাদের খুব আপত্তি ছিল। মা বলতেন—বোনকে আমরা হিংসে করি। বাবা বলতেন—পুরুষরা বেশী স্বার্থপর হয়, কিন্তু তোমাদের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তোমাদের অধিকারের সীমা নির্দেশ করে দিতে আমি বাধ্য হচ্ছি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই দিচ্ছি। তারপর আমাদের বিয়ের পর আমরা পৃথকই হয়ে গেলাম কার্যত।

এরপর—তখন নাইনটিন টোয়েন্টিনাইন, নভেম্বর, বাবা তখন বছর দুয়েক এসেছেন কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী। হঠাৎ চিঠি পেলাম—লাবণ্যের বিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে ভাল পাত্র পাওয়া গেছে। শিবপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করেছে—শরদিন্দু চ্যাটার্জী—ই-আই-আর-এ চাকরি করছিল। এখন সুযোগ পেয়েছে, বিলেতে যাবে বড় ডিগ্রীর জন্য। বাপ মা নেই। বাবার পাশের বাসাতে তার এক বন্ধুর বাড়ি আসত। লাবণ্যের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে নিজে এসে আলাপ করে। তারপর আসা-যাওয়া করেছে। এখন নিজেই সে উপযাচক হয়ে বিয়ে করতে চেয়েছে। বিয়ের পরেই সে বিলেত চলে যাবে। ফিরে আসা পর্যন্ত লাবণ্য বাবার কাছেই থাকবে।

বিয়েতে আমরা অবশ্যই এসেছিলাম। কিন্তু পাত্রটিকে আমরা দুই ভাই-ই পছন্দ করতে পারি নি। বিয়ের পর কয়েকদিনেই আলাপে আমরা বুঝেছিলাম—এ ছেলে একটা অ্যাড-ভেঞ্চারার। এক ধরনের রসিক নাক-উঁচু, বিদগ্ধ লোক আছে যারা সংসারে সুখ-দুঃখ-শোক, মানুষের পুত্রশোক নিয়েও রসিকতা করে—সেই ধরনের লোক। সকল লোককে আঘাত করে। এ তাই। কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের দুই ভাইকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে অস্থির করে তুলেছিল। দাদাকে বলত—রেল-দা, আমাকে বলত—তেল-দা! আমরা সহ্যই করেছিলাম। তবে বাবাকে বলে এসেছিলাম—ভাল করেন নি এ বিবাহ দিয়ে।

বাবা হেসে বলেছিলেন—কি ব্যাপার, রেলদা-তেলদা বলাতে চটে গেছ!

লাবণ্য দাঁড়িয়েছিল—সে হেসেছিল। নির্লজ্জের মত হাসি।

আমরা চলে এসেছিলাম। শরদিন্দু এক মাস পরেই বিলেত গিয়েছিল। এক মাস লাবণ্য শরদিন্দুর কোয়ার্টারে ছিল। তাকে সে রেখে দিয়ে গেল বাবার বাসায়।

তারপর মাস কয়েক পর আমি এসেছিলাম কলকাতায়, তখন শুনলাম লাবণ্য সন্তান-সম্ভবা।

বাবাকে একটু চিন্তাগ্রস্ত দেখলাম। শরদিন্দু চিঠিপত্রে এরই মধ্যে যেন বড় অমনোযোগী হয়েছে। তখন প্রায় দুটো মেল পেরিয়ে গেছে! লাবণ্য বিষণ্ণ। বাবা টেলিগ্রাম করেছেন লণ্ডনে শরদিন্দুকে —কেমন আছ?

এরপর আট মাসের মাসে তোমার জন্ম।

বিলেতে চিঠি লিখলেন বাবা। শরদিন্দু তখন চিঠি প্রায় লেখে না। উত্তরে শরদিন্দুর এই পত্র এল।

"আপনারা আমাকে প্রতারণা করিয়া বিবাহ দিয়াছেন। লাবণ্য বিবাহের সময়েই সন্তান-সম্ভবা ছিল। হিসাব করিয়া দেখিলে দেখিবেন—বিবাহের তারিখ হইতে সন্তানের জন্ম-কাল পর্যন্ত পূর্ণ আট মাসও নয়। এ সন্তানের পিতৃত্ব আমি অস্বীকার করিতেছি।"

এই দেখ তার ফটোস্টাট কপি।

তারপর এই পত্রের কপি দেখ। শরদিন্দু লিখেছে—লাবণ্যর সঙ্গেও আমার কোন সম্পর্ক নাই।

বাবা লিখেছিলেন—আরপর তুমি লিখিয়ো না। আজ হইতে তুমি আমাদের কাছে মৃত। আমরা জানিব—লাবণ্য বিধবা।

লাবণ্য তাকে কোন চিঠি দেয় নি, সেও তাকে কোন চিঠি দেয় নি। সংবাদটা বাবা দেন নি, কিন্তু তিনি পেনসনের সময় হওয়ার আগেই রিটায়ার করে কলকাতা ছেড়ে কাশী যাচ্ছেন শুনে আমি দাদা দুজনেই গিয়েছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম এর জন্য নালিশ করতে। কিন্তু লাবণ্য কঠিন পণ ধরেছিল—না।

বাবা চুপ করেই ছিলেন। শুধু বলেছিলেন—দেখ, যদি রাজী হয়। আমি হার মেনেছি।

আমরা বারবার প্রশ্ন করেছিলাম - কেন? কেন না বলছিস। তার সেই এক উত্তর—না। অর্থহীন 'না'।

কেমন যেন? বললাম—নালিশ না করলে ভবিষ্যতে কি হবে জানিস?

—না।

ভাবলাম, জানে না বলেই বলছে—না।' বুঝিয়ে বলেছিলাম—না হলে ওর কথাটাই অভিযোগটাই মেনে নেওয়া হবে। মানে—

তার উত্তর—না। আর কান্না তখন ঠিক বুঝি নি—বুঝি নি যে সে নিজে অপরাধী। ক্রাইম তার কিন্তু রেসপনসিবিলিটি আমার বাবা-মার। মেয়ের দিকে নজর রাখেন নি। কলকাতার পাড়ায় কানাকানি চলছে। বাবা রিটায়ার করে চলে গেলেন কাশী লাবণ্যকে নিয়ে। আমাদের সঙ্গে বাবা-মায়ের নিষ্ঠুর কলহ হল। সেই সময় এই সব চিঠিগুলি আমাদের হাতে এসেছিল, সঙ্গেও চলে এসেছিল।

তারপর—এই প্রমাণ। এই এলাহাবাদ কোর্টের নথি।

বাবা প্রচার করেছিলেন—মেয়ে বিধবা। স্বামী বিলেতে পড়তে গিয়ে মারা গেছে। লাবণ্য ভজন, কীর্তন আর পূজা নিয়ে রি-অ্যাকশনারীর যে জীবন—তাই-ই পালন করত। বাবা-মা

অবশ্যই খুব গৌরব বোধ করতেন। কিন্তু ভুল ভাঙল।

শরদিন্দু বিলেতে এলিস বলে একটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করে দেশে ফিরল। রেলেই বড় চাকরী পেয়েছিল। সে পুরো সাহেব তখন। কিন্তু বাংলা ভাষার উপর ঝোঁকটা ছিল। সে ভুল করলে। এলিসকে বাংলা শেখালে, এবং একদিন এলিস পেলে কতকগুলি চিঠি। চিঠিগুলি থেকে গিয়েছিল কোন-কিছুর তলায়। পড়ে সে জানতে পারলে—এখান থেকে যাবার আগে শরদিন্দু বিবাহ করেছিল। ইংরেজ মেয়ে—ক্রীশ্চান, সে জ্বলে উঠল। তাহলে তো তার বিবাহ অসিদ্ধ। সে তো তাহলে স্ত্রী নয়, সে তো রক্ষিতা। উপপত্নী! সে চ্যালেঞ্জ করলে শরদিন্দুকে। শরদিন্দু অস্বীকার করলে। শুধু তাই নয়- সে তখন খুব উদ্ধত, প্রচুর মদ্যপান করে। হি শ্লাপ্‌ড্‌ অন হার ফেস। এলিস ক্ষেপে গেল। বিলেতে তার করে নিজের বাবাকে আনালে। কলকাতায় এন-কোয়ারী করলে। বাবাকে পায় নি--তিনি বেনারসে—দাদা কলকাতায়, তার সঙ্গে দেখা করলে। এবং কেস করলে এলাহাবাদ কোর্টে। ক্রিমিন্যাল কেস। চিটিং অ্যাডালট্রি— তার সঙ্গে ডাইভোর্স।

শরদিন্দু জবাব দিলে—না। সব মিথ্যা। কারণ যে-বিবাহের কথা এলিস উত্থাপন করেছে তা অসিদ্ধ। কারণ এই কন্যা তখন গর্ভবতী ছিল। সেই হেতু হিন্দু ধর্মানুযায়ী এ বিবাহ অসিদ্ধ এবং নিছক একটি প্রতারণা মাত্র। এবং কন্যা পূর্বে বাপ-মায়ের অজ্ঞাতসারে বিবাহ করেছিল। সে কথা সে স্বীকার করেছিল তার কাছে।

এলিস দাদাকে সাক্ষী মেনেছিল। দাদা সাক্ষী দিয়েছিলেন। বিবাহের তারিখ—তোমার জন্ম তারিখ দাখিল করেছিল। এবং বাবার পত্র দাখিল করেছিল। এলিস লাবণ্যকেও সাক্ষী মেনে-ছিল।

শরদিন্দুর জবাবে বাবা ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। অবশ্য কাশীর সমাজে কথাটা গোপন রাখা হয়েছিল। দাদা এসে বাবাকে এবং লাবণ্যকে বলেন- সাক্ষী দিতেই হবে লাবণ্যকে। লাবণ্য সাক্ষী না দিলে---কোর্ট বিশ্বাস করবে শরদিন্দুর কথাই সত্য। লাবণ্যকে রাজী হতে হয়েছিল। উপায় ছিল না। বাবা-মা তীর্থে যাচ্ছি বলে, গিয়েছিলেন এলাহাবাদ। কিন্তু কোর্টে দাঁড়িয়ে লাবণ্য কি সাক্ষী দিয়েছিল—জান? সেটা নথিতেই আছে পড়।

নথি খুলে তলায় লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া অংশটা তিনি দেখিয়ে দিলেন। আমি পড়লাম। মামা মুখে মুখে বলে গেলেন—ওটা তিনি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন।

হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে যে বিবাহ সে বিবাহ অসিদ্ধই বটে। আড়াই মাস আগে আমি একজনকে গোপনে বিবাহ করেছিলাম। সন্তান তার। এঁর সঙ্গে বিবাহের পর ওঁর বাসায়—সে কথা প্রকাশ পায়। আমি স্বীকার করেছিলাম। এবং বলেছিলাম অন্তত রক্ষিতার অধিকারে এ ক'টা দিন আমাকে থাকতে দিন। আপনি বিলেত চলে যাবেন। আমি তখন বাপের বাড়িতে সব কথা খুলে বলে ব্যবস্থা করব। অথবা গৃহত্যাগ করে চলে যাব। কিন্তু তা পারি নি। উনি বিলেত থেকে পত্র দিলে সেই কারণেই আমি কোন কথা বলি নি। ওঁকেও পত্র লিখি নি।

উকিল প্রশ্ন করেছিল—যাঁর সঙ্গে সত্য বিবাহ আপনার হয়েছিল তাঁর নাম কি? উত্তর দিয়েছিল লাবণ্য—তিনি উনি নন। তার নাম আজও আমি প্রকাশ করতে পারব না।

বাবা দাদা মাথা হেঁট করে কোর্ট থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। টিটকিরি পড়েছিল কোর্টে। এরই মধ্যে লাবণ্য বেরিয়ে এসেছিল।

তাকে আর পাওয়া যায় নি। শুধু এইটুক জানা গিয়েছিল, বেরিয়েই একখানা টাঙা করে সে চলে গিয়েছিল।

বাবা আর খোঁজ করেন নি। বলেছিলেন —যাক। ও আমার কাছে মৃত। কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। দাদা বলেছিলেন অরফ্যানেজে দিতে, কিন্তু মা দেন নি।

শরদিন্দু খালাস পেয়েছিল কিন্তু ডাইভোর্স আটকায় নি এরপর। ডাইভোর্স হয়েছিল।

দেখ, ওর মধ্যে সবই আছে। দলিল মিথ্যে বলে না।

সত্য নিষ্ঠুর। হয়ত নিষ্ঠুরতম সত্য।

আমাদের বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে—লাবণ্য টাঙা করে গিয়েছিল এলাহাবাদের বাঈ-পল্লীর দিকে। এর কিছুদিন পরই এলাহাবাদে এক বাঈজীর খুব নামডাক হয়। সে লাবণ্য বলেই মনে করি।

* * *

দলিল মিথ্যা বলে না। তার সত্য আমার জন্য বহ্নিজ্বালা সঞ্চয় করে রেখেছিল। আমার এই সাতাশ বছরের জীবনের বুকে চিতা জেলে দিয়ে গেল। পত্র পেয়ে অবধি তখন পর্যন্ত চিতা সাজাচ্ছিলাম, এবার তাতে আগুন লেগে গেল—ওই আগুন। ওই দলিলে যেন সঞ্চিত ছিল সেই আগুন—যে আগুন বান্ধবহীন, গোত্রহীন, অপঘাতে মৃত মানুষকে চিতায় চড়িয়ে খড়ের মুড়ো জেলে মুখে দিয়ে চিতায় জেলে দেয়। এতকাল ধরে বিপাশা দেবী পিতৃমাতৃহীন আমি—মা বাপের স্নেহ পাই নি, চোখে দেখি নি, কিন্তু তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রেখে জগতে আনন্দ-যজ্ঞে নিমন্ত্রণ নিজে যেচে গ্রহণ করে জীবনকে যথাসাধ্য আনন্দ আর সমারোহে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে চেয়েছি। নিজে জল ঢেলেছি নিজের জীবন-বৃক্ষে, নিজে গোড়া খুঁড়েছি, সার ঢেলেছি, বলেছি —ফুল ফোটাও, ফুল ফোটাও। ফুল নয় ফুলঝুরি; হাসি-হাসি-হাসি! কান্না নয়, দুঃখ নয়। ও পালা তোমার মা আর বাবার স্নেহ-বঞ্চনার শোধ হয়েছে—শেষ হয়েছে। আর নয়। তুমি হাস, তুমি নিজের শক্তিতে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা অর্জন কর; সুখে আনন্দে নীল আকাশে শাখা মেল, প্রশাখা মেল, ফুল ফোটাও, গোড়া বেয়ে উঠুক লতা, জড়াক সর্বাঙ্গে, ফুটুক অজস্র ফুল।

এই আগুন লাগল সেই গাছে। এক মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গাছে পাতায় কাণ্ডে কি দাহ্য উপাদান ছিল, আগুনের স্পর্শমাত্র দাউ দাউ করে জ্বলল এবং পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বিপাশা দেবী, বাবা এঞ্জিনীয়ার ছিলেন—তাই আমিও এঞ্জিনীয়ার হয়েছিলাম। কিন্তু সব মিথ্যে হয়ে গেল।

এ বড় জ্বালা। এ বড় লজ্জা। এ বড় ঘৃণা।

মামাকে বললাম—বলুন, কী কাগজে কি সই করতে হবে?

মামা বললেন—তৈরী করে রেখেছি। উকীল ড্রাফট্ করে দিয়েছেন

বললাম—দিন, সই করে দি। কিন্তু একটি শর্ত

—কি ? বল ?

—এই সব প্রমাণগুলি আমাকে দিতে হবে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—তাই হবে। তবে দাদার কাছে যে কপি আছে - সেটা আনতে হবে। তুমি পরশু এসে নিয়ে যাবে। আজ এগুলি নিয়ে যেতে পার।

-বেশ। বলে সই করে দিয়ে ওই কাগজগুলো স্যুটকেশে পুরে বেরিয়ে এলাম।

পথে বেরিয়ে ট্রাম রাস্তায় এসে মনে হল—ঝাঁপ দিয়ে পড়ি ট্রামের তলায়। যাক, শেষ হয়ে যাক। দিতামও ঝাঁপ। কিন্তু ট্রামটা থেমে গেল, একখানা গাড়ি ডান দিক থেকে এসে তার সামনে চলতে শুরু করে দিলে। গাড়িটার সামনে কোথা থেকে এল একটা ছোট ছেলে। বেঁচে গেল—ড্রাইভার গাল দিলে। সে হেসে জিভ বের করে ভেংচি কেটে গেল।

মনে হল ছেলেটা ভেংচি ওকে কাটে নি। আমাকেই কেটেছে।

তারপর ডি-ভি-সি হেড কোয়ার্টারে গিয়ে রেজিগনেশন দিয়ে এলাম। উঠলাম—যে হোটেলে উঠতাম সে হোটেলে নয়। এসপ্ল্যানেডের আশে-পাশের হোটেলে। যেখানে প্রয়োজন হলে বারের পানীয়ের সান্ত্বনা মিলতে পারবে। বিশ্বাস করুন, জীবনে মদ আমি কখনও খাই নি। তবে শুনেছি নিদারুণ শোকে দুঃখে আঘাতে মদ খায়। একদিন মদ কিনেছিলাম। কিন্তু তার গন্ধ ভাল লাগে নি। মুখের কাছে তুলে ফেলে দিলাম।

রাত্রে মরব স্থির করলাম। তার আগে আপনাকে চিঠি লিখতে বসলাম। মনে হল—একটা জবাবদিহি আপনার কাছে দিতে আমাকে হবে। আমার শিক্ষা—আমার সংস্কৃতি সব কিছুর মূল্য পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—তবু যেন হৃদয়ের অংশ কিছুতেই পোড়ে নি। শবদাহের অভিজ্ঞতা আপনার নেই—থাকলে জানতেন একটু অংশ সহজে ছাই হয় না। একটা স্নায়ুর পিণ্ড অবশিষ্ট থেকে যায়। এ যেন তাই। এটা আমরা জলে ভাসিয়ে দিয়ে থাকি। আপনার সঙ্গে সম্পর্কটা আমার ওই স্নায়ুপিণ্ডের মত। ওটাকে আমার জীবনের এই কথার মৃত্তিকা দিয়ে মড়ে পাঠাব আপনাকে—আপনি গঙ্গার জলে বিসর্জন দেবেন। কিন্তু পরে ভাবলাম—কি হবে ?

ছিঁড়ে ফেললাম।

তারপর সারাটা দিন কাঁদলাম। সন্ধ্যায় আবার বসলাম চিঠি লিখতে। কিছুটা লিখে ছিঁড়ে দিলাম। পরের দিন চলে এলাম হাওড়া স্টেশন।

কোথায় যাব ?

টিকিট কাটলাম এলাহাবাদের। খুঁজব—আমার মাকে খুঁজব। শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের জন্য কোন আকর্ষণ ছিল না। তাঁর অপরাধ কি ? তাঁর সঙ্গে সম্পর্কই বা কি !

এলাহাবাদে এসেছি আজ পঁচিশ দিন। মাকে খুঁজলাম। এলাহাবাদের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। ভোরবেলা উঠে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত।

ভোরবেলা যেতাম—গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে। বসে থাকতাম। ফোর্টের দেওয়ালে হাতে লিখে চল্লিশ-পঞ্চাশখানা কাগজ সেঁটে দিয়েছি।

লাবণ্য দেবী, মা, তোমার ছেলে দিবেন্দু তোমাকে খুঁজছে। সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছি, কোন

মহিলা তা পড়েন কিনা। পড়ে তাঁর কি প্রতিক্রিয়া হয়।

বিপাশা দেবী, বেলা দুপুরে সেখান থেকে ফিরে পথে পথে ফিরেছি।

লিখতে ভুলেছি বিপাশা দেবী, মামার কাছ থেকে দুখানা ছবি পেয়েছিলাম। একটায় বিবাহ-সজ্জায় বাবা ও মা। অন্যটায় শুধু মা। বাবার না—শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের মুখে কালি লেপে দেওয়া আছে। দিয়েছিলেন মামা। যাক—তার চেহারায় তো আমার প্রয়োজন নেই। রাগও বোধ হয় মামার অকারণ। কারণ সমস্ত কিছুর দায় তো আমার, আমার মায়ের। তাঁর যদি এতখানি সাহসই হল, তবে আমাকে তিনি প্রসবের পর কাশীর কোন কুণ্ডে নিক্ষেপ করেন নি কেন? এই প্রশ্ন করবার জন্যই তাঁকে খুঁজছি। জানি না যদি ক্রোধ হয় তবে হয়তো মাতৃহত্যাই করব। কিন্তু কই আজও তো পেলাম না। রাত্রিতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত যে মহল্লায় গান-বাজনা হয় খুঁজেছি। সন্ধান করেছি 'বাঙালী বাঈজী' কেউ আছে কিনা? বাঙলা গান কেউ শোনাতে পারে কি না? কি নাম? কত বয়স? ছবি দেখিয়েছি—এর সঙ্গে কোন মিল আছে কি না? বাঙলা গান জানা বাঈ আছে। বাঙালীও আছে। কারুর সঙ্গে মেলে নি। তারা কেউ নয়। তাঁকে পাই নি।

কেউ বলে—লক্ষ্ণৌ খোঁজ কর। গানের সমাদর, রূপের সমাদর সেখানে।

কিন্তু অকস্মাৎ আমার ধৈর্য ভেঙে গেছে।

কি করব খুঁজে? কি হবে?

এই সংসারে যারা প্রবৃত্তির তাড়নায় কুল-ধর্ম, শিক্ষা, জীবনের গৌরব, প্রশংসা সব বিসর্জন দিলে—তারা কি জবাব দেবে?

কল্পনা করেছি, দেখা পেয়েছি, প্রশ্ন করেছি—তুমি এ কাজ কেন করলে?

চোখে সুরমা, মুখে রঙ, ঠোঁটে রঙ, সুবিন্যস্ত কেশ কলাপের মধ্যে হয়তো কয়েকটি রূপোলী চুল—তিনি হেসে বলেছেন—এর জবাব নেই। হয় না। আমি তবু প্রশ্ন করছি—কেন হয় না? বল।

অকস্মাৎ তার চোখে অগ্নি-দীপ্তি খেলে গেল—তিনি বললেন—জানি না, জানি না, জানি না। তুমি চলে যাও।

আবার কল্পনা করেছি—দুটি জলের ধারা নেমে এল চোখের কোল থেকে। উদাস দৃষ্টিতে কৎসিত ছবিতে ভরা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলেছেন—জানি না। বলতে পারব না। সুতরাং কি হবে খুঁজে আর? কিন্তু আমি? আমি কি করব? আজ পঁচিশ দিন ধরেই এই চিঠিটা একটু একটু করে লিখছি। আজ চিঠি শেষ করছি। কারণ ভবিষ্যতের কথা আমি স্থির করেছি। আপনাকে সবটা জানানো—বলেছি তো কোন যুক্তি থেকে নয়, শুধু হৃদয়ের তাড়নায় লিখছি। প্রেম নয়। প্রেমে আমার অধিকার নেই। শুধু আপনার কাছে আমি প্রতারক নই এই একটি কথা উপস্থিত করতে—সব কথা না লিখে উপায় ছিল না। তাই লিখলাম। শেষ আগেই করতে পারতাম। ওই মামার বাড়ির ঘটনার পর। কিন্তু তবু সেটাকে টেনে যাচ্ছিলাম কেন জানেন? নিত্য ব্যর্থ হয়ে ফিরে সেই কথা চিঠিতে জুড়ে যেন মনটা একটু সান্ত্বনা পেয়েছে। এবং মায়ের সঙ্গে দেখা হলে—তিনি কি বলেন—সেটাও আপনাকে জানাতে চেয়েছিলাম।

এইখানে শেষ করলাম। ভাবছি, যে জিন্দিগীতে আনন্দ নেই—সে জিন্দিগী সাচ্চা না ঝুটা?

আমাকে কি সব শুনে কেউ 'জিতা রহো' বলে আশীর্বাদ করবে ? আমার ভিতর থেকে কেউ যেন বলছে—মর যাও। তুম্ মর যাও। তুম্ মর যাও।

ইতি—হতভাগ্য দিব্যেন্দু

ঠিকানা নাই। শুধু রেজেস্ট্রী করা খামে প্রেরক ডি. চ্যাটার্জির নাম তলায় লেখা—কেয়ার অফ পোস্ট মাস্টার—

পৃথিবীটা কালো হয়ে গেছে। অর্থহীন হয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে সে জানে না। কিন্তু কেমন হয়ে গেছে।

চিৎকার করে উঠল চুড়কি—পড়ে যেছ যি। হেই! হেই! হেই!

ধরে ফেলল সে বিপাশাকে।

আট

তিন দিন পর এলাহাবাদ স্টেশনে নামল বিপাশা। থাকতে সে পারে নি, ছুটে এসেছে। এ তার প্রেম, না প্রীতি, না মায়া, না মমতা, না স্নেহ সে তা বিশ্লেষণ করে নি। একটা দুর্নিবার আকর্ষণে আর দুরন্ত আশঙ্কায় সে ছুটে এসেছে। দিব্যেন্দুর পত্রের ওই শেষ লাইনটা—মর্ যাও। তুম্ মর্ যাও। তুম্ মর্ যাও।—এইটে যেন কোন মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর মানুষের আর্তনাদের মত তাকে আহ্বান করছে। গিয়ে তাকে কি বলবে, সে তা জানে না, বলতে পারে না। চিঠিতে তারিখ ছিল না, কিন্তু ডাকে দেওয়ার তারিখ বারো দিন আগে। সে কলকাতা চলে যাওয়ার পরই এসেছে। মিত্তির নিয়ে রেখেছিল। কদিন আগে বাইরে যাওয়ার সময় সে চুড়কিকে দিয়ে গেছে। বারো দিন!

সে যদি আজও বেঁচে থাকে এবং দেখা হয়—তবে তাকে সে কি বলবে জানে না। সে যদি প্রশ্ন করে—বলুন, বেঁচে থেকে কি করব ? তার উত্তরে সে কি বলবে, জানে না। তবু সে এসেছে। এমন একটি মানুষ, এমন একটি প্রাণ, তার এই মর্মান্তিক বেদনায় সে থাকতে পারে নি—ছুটে এসেছে। ট্রেনে ওঠা পর্যন্ত সমস্ত কিছুর পিছনে ছিল একটি দুর্বার আবেগের ঠ্যালা। ট্রেনে উঠে ছিল শুধু উদ্বেগ। মর্মান্তিক উদ্বেগ। কি দেখবে গিয়ে ? কি দেখবে ? এলাহাবাদের যত কাছে এল ততই প্রশ্ন জাগল—কি বলবে ? স্থির করতে পারলে না কি বলবে। স্টেশনে নেমে প্যাসেঞ্জার-দের ভিড়ের সঙ্গে অনেকটা স্রোতে-ভাসা বস্তুর মত বেরিয়ে এল।

কুলিটা প্রশ্ন করলে—কোথায় যাবে মেমসাহেব ?

—অ্যাঁ ? এ কথাও ভাবেনি। সে প্রশ্ন করলে—অ্যাঁ ?

—কাহা যাউঙ্গী ? হোটেল ?

—হাঁ।

—টাঙ্গা না ট্যাক্সি ?

—ট্যাক্সি।

ট্যাক্সিওয়ালা প্রশ্ন করলে—কোন্ হোটেল ?

বিপাশা বললে—পহেলে চলো প্রয়াগসঙ্গম ঘাট।

—সঙ্গম ঘাট ?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। ওর পরে আসব হোটেলে। তোমার ট্যাক্সিতেই আসব।

দিব্যেন্দুর পত্রে ছিল সে ভোর বেলা থেকে এসে বসে থাকে এই সঙ্গম-তীর্থের ঘাটে। দেওয়ালে সে সেঁটে দিয়েছে, "লাবণ্য দেবী—মা, তোমার ছেলে দিব্যেন্দু তোমাকে খুঁজছে।" আজও যদি সে বেঁচে থাকে তো সেখানেই পাবে। মনে তার সংশয় নেই। বিরোধী যুক্তি ওঠেই নি। উঁকি মারতে চেয়েছিল। সুস্থ হয়ে কোন দূর দেশান্তরে গিয়ে জীবন আরম্ভ করতে পারে—যেখান পর্যন্ত এই পরিচয় পৌঁছবেই না। নিজের মনই তিরস্কার করেছিল—ছি—ছি—ছি!

ভোরবেলা সবে সূর্যোদয় হচ্ছে। রাস্তায়-ঘাটে লোকজন কম। মধ্যে মধ্যে সতর্ক হয়ে রাস্তার লোকজনের দিকে দেখছিল বটে, কিন্তু চোখে যেন দৃষ্টি ছিল না, একটা আচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন ছিল—মর্মান্তিক শোকের পর যেমন একটা আচ্ছন্নতা মানুষকে মগ্ন করে রেখে দেয়, ঠিক তেমনি। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ মনে হচ্ছিল—ও কে ? বা, ও সে নয় ? পিছনের কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। না, সে নয়। প্রথম সচেতনতা এল সঙ্গম ঘাটের উপরে এসে। গাড়ি থেকে নেমেই গঙ্গার শুভ্র জলধারার দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে গেল দিব্যেন্দুর নৃত্যনাট্যের কথা। গঙ্গার কি মহিমাই সে বর্ণনা করতে চেয়েছিল। সে তো তার বন্দনা! চোখে তার জল এল। এবার তাকালে সে সঙ্গমতীর্থের দিকে। নীল যমুনার জল আর শুভ্রধারা গঙ্গার জল পাশাপাশি চলেছে। যমুনা যদি নদ হত!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অগ্রসর হতে গিয়ে প্রথম মনে হল—কি বলবে সে ? আবার দাঁড়িয়ে গেল। তাই তো! গিয়ে কি বলবে ?

মুহূর্তে কথা মনে এসে গেল। পেয়েছে সে।

বলবে—তার হাতখানি ধরে বলবে—ওঠ! ফিরে চল!

চলতে লাগল সে। বলবার কথা পেয়েছে সে। সঙ্গে বল পেয়েছে।

কোথায় সে ? সে বলবে, অনেক কথা তার মনের মধ্যে যেন জমে উঠেছে, কথার পর কথা। সে বলবে—ওঠো। চল। না-থাক তোমার কুল-পরিচয়, পিতৃ-পরিচয়—তুমি হও নূতন বংশের প্রথম পুরুষ। তোমার পরিচয় তোমার কর্মে, তোমার কীর্তিতে, তোমার আচরণে। তুমি নূতন সত্যকাম। ওঠো।

হোক তোমার জন্ম অন্ধকার পঙ্ক-বাসরে—তুমি তা থেকে উঠেছ পঙ্কজের মত। তুমি কৃষ্ণ-কমল—

চলতে চলতেই সে মনে মনে আওড়াচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মনে মনে কথা গাঁথাও বন্ধ হল। দৃষ্টি পড়ল তার কোর্টের দেওয়ালের গায়ে। একখানা চৌকো কাগজ সাঁটা। তাতে বড় হরফে বাংলায় লেখা—"লাবণ্য দেবী! মা, তোমার ছেলে দিব্যেন্দু তোমাকে খুঁজছে।

দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী।”

ওই আর একটা। বোধহয় আর একটা। হ্যাঁ। ওই আরও আরও দূরে আর একটা। কিন্তু সে কই? সে? সেইখানে দাঁড়িয়েই সে তার দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলে কোর্টের কোণের ঘাট পর্যন্ত। অনেক মানুষ। জনতা। যাচ্ছে আসছে। নারী-পুরুষ, মাঝি-মাল্লা, পাণ্ডা-সাধু-সন্ত স্নানার্থী-ফেরিওলা। সারি সারি ভিক্ষুক বসে আছে। কিন্তু সে কই? হঠাৎ তার মনে হল—সে কি তার সকল জীবন-গৌরব ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে সর্বাঙ্গ ধুলিধূসর করে নিয়ে ওই ভিক্ষুকদের মধ্যে বসে আছে!

সে তাদের সারির দিকে তাকিয়েই চলতে লাগল। এসে দাঁড়াল একেবারে কোর্টের কোণে। যমুনার তটে। কিন্তু কই সে?

লোকজন একটু কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে তার দিকে। তার সেই বিচিত্র রঙ চোখ চুল। ভেবেছে বোধহয় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কি মেমসাহেব শাড়ি পরে দেখতে এসেছে প্রয়াগের সঙ্গমতীর্থ। কিন্তু তার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে খুঁজছিল—সে কই? কোথায়?

বুকের মধ্যে আবেগ তার আর রুদ্ধ করে রাখতে পারছে না সে। ইচ্ছে করছে চিৎকার করে ওঠে 'দিব্যেন্দু' বলে।

সকল সংকোচের বাধা-বন্ধ ঠেলে সরিয়ে ফেলে এখানকার মাঝি-মাল্লা দোকানদার যারা থাকে এখানে—তাদের সে জিজ্ঞাসা করবে? জিজ্ঞাসা করবে—তাকে দেখেছ? যে এইসব কাগজ দেওয়ালে সেঁটেছে, যে রোজ এইখানে এসে কোন একটা কাগজের নীচে উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে থেকেছে—লম্বা মানুষ, কোঁকড়া চুল, বড় চোখ, কালো রঙ, ভরাট গলা—দিব্যেন্দু নাম—দেখেছ?

* * *

দেখেছে।

খোঁজ মিলল। সংকোচ ঘুচিয়ে দোকানদারের কাছে যেতেই তারা বললে।

দেখেছে বইকি। প্রতিটি দিন ভোর থেকে দুপহর বেলা পর্যন্ত এখানে বসে থেকেছে। কারুর সঙ্গে কোন কথা বলে নি, আলাপ করে নি, কিন্তু চোখ সকলেরই তার উপর পড়েছিল। কিন্তু—। বারো দিন আগে, সে দিন ভোরবেলা তাকে ওই—ওইখানে ওই একটা কাগজের তলায় সে আপনার গলা আপনি কেটেছে একটা ব্লেড দিয়ে। দেখতে পাবে ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠে কাগজটার উপরে লেগেছে, দেওয়ালে লেগেছে, মাটি যদি দেখ—তবে এখনও দেখতে পাবে, রক্তে ভিজে মাটি কাদা হয়েছিল, শুকিয়ে ডেলা বেঁধে গেছে। এখনও কুত্তাগুলো উয়ার গন্ধ পায়, ঠোকরায়। দশ-বারো রোজ হয়ে গেল, এখনও রক্তের গন্ধ ওঠে।

—সে নাই? চিৎকার করে উঠল সে!

লোক কিছু জমেছিল। দোকানীর ভুরুতে প্রশ্ন জাগল।—আপনার কেউ?

—হ্যাঁ। সে তাহলে—

—জানি না ঠিক। সে গলা কেটে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, ভাগ্যক্রমে এক সাধু সেই অবস্থায় তাকে দেখতে পান। স্নানে আসছিলেন তিনি। তিনি হল্লা করে লোকজন ডেকে এখানকার সিপাহাকে ভি নিয়ে গাড়ি করে তুলে নিয়ে যান। আপনি কোতোয়ালীতে যান, যেখানে বিলকুল

খবর আপনার মিলবে। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি, তামাম খুন তার বেরিয়ে গিয়েছিল। আঃ—জোরদার জোয়ান—সে খুন কি লাল আর কি গরম! ওঃ হো!

সিপাহীটি বললে—হ্যাঁ। ও তো হাসপাতালে আছে। মরলে তো হয়ে গেল, বাঁচলে ওর বিচার হবে। আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। পুলিস তো ওকে গ্রেপ্তার করেছে। জামিনে আছে, ওই সাধুজী ওর জামিন দিয়েছে।

* * *

অদৃষ্টের পরিহাস?

তাছাড়া কি বলবে? নইলে যে কলঙ্করেখা দিব্যেন্দু নিজের কণ্ঠনালী ছিন্ন করে রক্ত ঢেলে রক্তাক্ততার মধ্যে অবলুপ্ত নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল, সেই লেখা ওই রক্তবর্ণের অনুরঞ্জনে অগ্নি-বর্ণ হয়ে ফুটে উঠতে চলবে কেন? দিব্যেন্দু ভাবে নি—হয়তো তার ভাববার মত মস্তিষ্কের স্থিরতা ছিল না; ভাবে নি—বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর চিকিৎসাবিদ্যায় এইভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা, মৃত্যুর কিছু পূর্বে চোখে পড়লে এবং চিকিৎসা হলে—সার্থক হয় না।

সে গোঙাচ্ছিল, ছটফট করছিল, সাধুটি টর্চ জেলে দেখে এগিয়ে এসেছিলেন। লোকজন ডেকে-ছিলেন। তারপর হাসপাতালে এনেছিলেন। রক্তের দরকার হয়েছিল; রক্ত তিনিই দিয়েছিলেন।

বিচিত্র কথা—দিব্যেন্দুর দেহের রক্ত যে গ্রুপের, তাঁর রক্তও সেই গ্রুপের। এই বারো দিনে সন্ন্যাসী দুদিন রক্ত দিয়েছেন।

কোতোয়ালীর অফিস-ইন-চার্জ বললেন—বেঁচে সে গিয়েছে। কিন্তু দেখুন অদৃষ্টের পরিহাস—আত্মহত্যার চেষ্টার অপরাধে মামলা হবে—সেই মামলায় যা ঢাকতে উনি এই কাণ্ড করেছেন, তা প্রকাশ হয়ে যাবে। একখানা চিঠি পাথর চাপা দিয়ে কাছে রেখেছিলেন ভদ্রলোক; ওর হোটেলে খানাতল্লাসী করেও আর একখানা পেয়েছি। তাতে লিখেছিলেন কি জানেন? লিখেছিলেন—"আমার জীবনের কলঙ্কলেখা রক্ত ঢেলে লেপে নিশ্চিহ্ন করছি আমি। এ আমার বিষাক্ত রক্ত—নিঃশেষে নির্গত করে দিয়ে মরতে চাই। আমার এই মৃত্যু স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ। এর জন্য কেউ দায়ী নয়।"

হাসলেন কোতোয়ালীর অফিসার-ইন-চার্জ।

বিপাশা যেন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল।

বেঁচে গেছে দিব্যেন্দু। বারো দিন পার হয়ে গেছে। বুকের মধ্যে মর্মান্তিক আশঙ্কার উদ্বেগটা আর নেই। কিন্তু সে ভাবছিল কোতোয়ালীর অফিসারের কথাটাই কি সত্য? অদৃষ্টের পরিহাস? দিব্যেন্দুকে আদালতে দাঁড়াতে হবে, এবং এই কলঙ্কের শীলমোহরের ছাপ এঁকে নিতে হবে?

সে হয়তো আদালতে কোন কথা না তুলে অপরাধ স্বীকার করে নিতে পারে। কিন্তু পুলিস তো উদ্‌ঘাটন করতে দ্বিধা করবে না। হে ভগবান!

কোতোয়ালী থেকে হাসপাতালের ঠিকানা নিয়ে সে হাসপাতালে চলল। মুহুর্মুহু চোখ ফেটে জল আসছিল। অকস্মাৎ যেন একটা চিন্তা তার মস্তিষ্কের মধ্যে খেলে গেল।

সে হবে মিথ্যাবাদিনী। মিথ্যা কলঙ্ক সে নেবে তার মাথায়। সে আদালতে গিয়ে বলবে—

উনি যে কথা বলতে চান না, সেই কথা আমি বলছি। উনি আমার স্বামী। আমরা গোপনে বিবাহ করেছিলাম। দিল্লীতে তখন আমি পড়ি। বোর্ডিংয়ে থাকি। সরকার থেকে বৃত্তি পাই পিতৃমাতৃ-হীনা কুমারী রেফ্যুজী বলে। স্বামী চাকরী করেন—এই কারণে যদি তা বন্ধ হয়, সেই ভয়ে গোপন করেছিলাম। তারপর পাঞ্চেতে যখন এলাম, তখন আর একজনের সঙ্গে প্রেমে পড়ি আমি।

কিন্তু কি করে বলবে সে? কান্নায় সে ভেঙে পড়ল। বারবার চোখ মুছলে। গাড়িটা এসে প্রায় সেই মুহূর্তেই দাঁড়াল হাসপাতালে।

নামতে নামতে সে মনকে দৃঢ় করলে। বলতেই হবে। বললে—আমি বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছিলাম। এবং এই নিয়ে তার সঙ্গে কুৎসিত ঝগড়া হয়। উনি ক্ষোভে রাগে মাইথন থেকে নিরুদ্দেশ হন। আমি পরে অনুতপ্ত হয়ে ওঁকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছি।

সে আফিসে গিয়ে ঢুকল।

বললে—ফোর্টের ধারে দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী—যিনি গলা কেটে সুইসাইড করতে গিয়েছিলেন—তাঁর খোঁজে এসেছি। তিনি—

ডাক্তার বললেন—তিনি এখন আউট অফ্ ডেঞ্জার, ভালো আছেন।

—আমি তাঁকে দেখতে চাই একবার।

—এখন তো ভিজিটিং আওয়ার্স্ নয়। তাছাড়া,—তিনি পুলিস কেসের আসামী, অবশ্য জামিনে আছেন।

কাতর মিনতি করে উঠল বিপাশা—প্লিজ! প্লিজ; আমি বহুদূর থেকে আসছি। বাংলাদেশ থেকে। আমি—আমি তাঁর স্ত্রী!

—স্ত্রী! কি বলছেন?

—হ্যাঁ, আমি তাঁর স্ত্রী।

—তিনি জ্ঞান হয়ে অবধি বলছেন—কেউ কোথাও নেই আমার। বিশ্ব-সংসারে আমি একা—।

—আমার উপরেই অভিমান করে। ডাক্তারবাবু! পাঁচ মিনিটের জন্য।

ডাক্তার বোধ করি বিরক্তি এবং করুণা দুয়ের জন্যই বিচলিত হলেন। একটু ভেবে বললেন—দাঁড়ান দেখি। বেরিয়ে গিয়ে কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে বললেন—একটু বসুন। সি-এম-ও পারমিশন দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর ঘরে এখন সেই সাধুটি আছেন। যিনি তাঁকে বলতে গেলে বাঁচিয়েছেন। এখনও যিনি তাঁর জামিনদার।

মন তার বড় ক্লান্ত, বড় শ্রান্ত। সব উত্তেজনা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বড় পরিতৃপ্ত। তাই সে বলবে। দিব্যেন্দুকে বলবে—তুমি না বলতে পাবে না। আমি তা বলব।

টেবিলের উপর মাথা রেখে সে কল্পনা করতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন মনে পড়ছে—'মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল মক্ষিকার মত।'

আদালতে মানুষের ভিড় জমেছে। ফিস ফিস কথা, হাসি। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছে—দিল্লীতে তার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। গোপনে বিবাহ করেছিলাম—

—উঠুন আপনি। স্বামীজী এসে গেছেন।

—এঁ্যা! মাথা তুলল বিপাশা। এসে—? কিন্তু কথা শেষ হল না তার। এ কি?

—বিপাশা! তুমি! দিল্লীর স্বামীজি। যিনি তাকে মিশনারীদের হাত থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের আশ্রমে।

—আপনি? আপনি দিব্যেন্দুকে বাঁচিয়েছেন?

—তুমি চেন দিব্যেন্দুকে?

ডাক্তার বললেন—উনি ওঁর স্ত্রী বলছেন।

—স্ত্রী!

বিহ্বল হয়ে গেল বিপাশা। সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে তার এতক্ষণের সেই রচনা করা মিথ্যাটি বলে গেল। তার সঙ্গে সে জুড়লে—সেই যে কনস্টিটুশন হলে কবিতা নিয়ে ঝগড়ার কথা বলেছিলাম—সে ওঁরই সঙ্গে। শুধু মিটমাট নয়, বিবাহ হয়। গোপনে।

একটি অর্ধস্ফুট ম্লান হাসি স্বামীজীর মুখে ফুটে রইল সারাক্ষণ। তিনি শুনছিলেন, না কোন দূরের কোনও কথা ভাবছিলেন—ঠিক বোঝা গেল না। শুধু বিপাশার কথা শেষ হতেই একটু বেশী হেসে ফেললেন। আশ্চর্য, চোখ দুটিও সজল হয়ে গেছে। চোখ মুছে বললেন—এমন করে ঝগড়া করো না মা। যাতে—। আবার হাসলেন, বললেন—দৈবক্রমে আমি এসে গিয়েছিলাম। আমি সন্ন্যাস নিয়েছিলাম এই প্রয়াগের ঘাটেই ব্রাহ্মমুহূর্তে। সে অনেক দিনের কথা, বাইশ বছর। প্রতি বৎসর ঐ দিনটিতে আসি, এখানে স্নান করি। ত্রিরাত্রি বাস করি, আবার চলে যাই। এবারও এসেছিলাম মা। তবে ত্রিরাত্রির বদলে পাঁচ রাত্রি হয়ে গেল—আটকা পড়েছিলাম। হঠাৎ সেদিন ভোরবেলা সঙ্গমতীর্থে স্নান করব—নামছি—কানে গেল মানুষের গোঙানি। হাতে টর্চ ছিল, জ্বেলে দেখি সবল যুবা রক্তে ভাসছে। ছুটে গেলাম। লোকজন ডাকলাম। ভগবানের কৃপা—আর কি? বেঁচে গেছে, সুস্থই প্রায় হয়েছে। যাও, তুমি যাও, দেখা করে এস। যাও।

ডাক্তার বললেন—আসুন।

বিপাশা অগ্রসর হল। তার পা আবার কাঁপতে শুরু করছে।

৫

নতুন বাড়ি হাসপাতালের। দীর্ঘ প্রশস্ত সিঁড়ি। সিঁড়িটার একধার ঘেঁষে রেলিংটা আশ্রয় করে উঠল বিপাশা। এখনও যেন পা কাঁপছে, বুকের মধ্যে আবেগটা আবার প্রবল হয়ে উঠেছে।

ছোট একখানি ঘরে দিব্যেন্দুকে রাখা হয়েছিল। একটা কেবিন। দরজা খুলে ডাক্তার বললেন—মিঃ চ্যাটার্জী!

অর্ধশায়িত দিব্যেন্দু তাকিয়েছিল খোলা জানালা দিয়ে। চোখে সেই দৃষ্টি, যে দৃষ্টি আকাশ-পাতালে ছড়িয়ে আছে, যার মধ্যে কোন কল্পনাও নেই, আছে শুধু অসীম ব্যর্থতার শূন্যতা।

আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে দিব্যেন্দু বললে—ইয়েস, ডাঃ সিন্‌হা—বলতে বলতেই সে চমকে উঠল। বিপাশা ডাক্তারকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়েছে। চোখের ধারা আর বাঁধ মানে নি, নেমে এসেছে। দিব্যেন্দু বলে উঠল—বিপাশা দেবী!

* *

আমি বিয়াস। বলে দ্রুতপদে গিয়ে সে বিছানার একপ্রান্তে বসল।

ডাক্তার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন।

ক্লান্ত দুর্বল দিব্যেন্দু শীর্ণ পাণ্ডুর। তার মুখে চোখে যে একটি সজীব আনন্দের বর্ণাঢ্য প্রকাশ ছিল—তা নিঃশেষে মুছে গিয়েছে। বিষণ্ণ বেদনাতুর শোকার্ততার ছায়া যেন নীল আকাশের উপরে দূরস্থিত কোন ঘনকৃষ্ণ মেঘের ছায়ার মতই বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। সেই দিব্যেন্দু, দুর্বল অবশ্য, কিন্তু তার চোখের, মুখের হাসির, কথার আনন্দ-দীপ্তি ওই ছায়ার মধ্যে হারিয়ে গেছে। গলার ব্যাণ্ডেজটা খোলা রয়েছে—সেখানে একটা রক্তাভ মোটা দাগ দেখা যাচ্ছে। ওঃ, কি নির্মম ভাবেই সে নিজেকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল।

—আমি বিয়াস। বলে বসে দিব্যেন্দুর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিতেই দিব্যেন্দুর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল—চোখ থেকে দুটি বিশীর্ণ 'ধারা' নেমে এল। কোন রকমে আত্ম-সম্বরণ করে সে বললে—আপনি কেন এলেন বিপাশা দেবী আমাকে দুঃখ দিতে?

দিব্যেন্দু, এ কথা তুমি বলো না, এমন করে তুমি বলো না। না।

—না-বলে কি করব? আমার পত্র তো পেয়েছেন?

—পেয়েছি। পেয়েই ছুটে এসেছি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

—ফিরিয়ে নিয়ে যেতে? হাসল সে।—এরও পর?

—হ্যাঁ, এরও পর। তুমি পুরাতন সত্যকাম নূতন জন্ম নিয়েছ। তুমি লিখেছ,—পঙ্কবাসরের সূতিকাগৃহে তোমার জন্ম। কিন্তু তুমি পঙ্কজ হয়ে ফুটেছ, জলতল ভেদ করে আলোকের সত্যে প্রকাশ করেছ নিজেকে। তুমি মানস সরোবরের সুদুর্লভ নীল কমল। আমি শ্বেত ভ্রমরী—

—না-না-না। বিপাশা দেবী, মরতে গিয়ে মরা আমার হয় নি, ওই সন্ন্যাসী পুণ্য অর্জনের জন্য আমাকে বাঁচালেন। বাঁচতে আমাকে হবে—এই মাতৃকলঙ্ক শিরোধার্য করে জীবন আমাকে টানতে হবে। টানব। দূরে দূরান্তরে পতিতের মধ্যে অন্ত্যজের মধ্যে তাদেরই একজন হয়ে বাঁচব। আমার সঙ্গে আপনি নিজেকে জড়াবেন না। আবার তার চোখ থেকে নামল জলের ধারা।

বিপাশা তার আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বললে—তুমি কাঁদছ? না। কাঁদবে কেন? কি প্রয়োজন তোমার জন্ম-পরিচয়ে? তুমি করবে নূতন বংশ, নূতন গোত্রের প্রতিষ্ঠা। ধর্মে পুণ্যে কর্মে বীর্যে—স্মরণীয় প্রথম পিতা। আমি সেই বংশকুলের প্রথম মাতা।

আর্তনাদ করে উঠল দিব্যেন্দু। না—না—না। তুমি ভুলে যাচ্ছ বিয়াস—

বিপাশা বলে উঠল—আঃ, বাঁচলাম, তুমি আমাকে বিয়াস বললে—

বিষণ্ণ হেসে দিব্যেন্দু বললে—ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু তুমিও ভুলে যাচ্ছ—তোমার মাতামহ বংশের কোন্ মহিমময়ী কন্যা তুমি—যারা—

বাধা দিয়ে বিপাশা বললে—বললেই চুকে যায় দিব্যেন্দু ওই মিথ্যে আমি বিংশ শতাব্দীর মেয়ে—আমি বিশ্বাস করি নে। বাবা যা বলতেন—তাই সত্যি, হেরিডিটির বিচিত্র খেলায় আমার মত মেয়ে মধ্যে মধ্যে জন্মায়—আমিও তাই; সচরাচর সাধারণ থেকে আমরা স্বতন্ত্র, বিচিত্র। কালে-কালে কাল অনুযায়ী ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তা বলব না—তোমার কথাকে বড় করেই উত্তর

দেব—আমি আমার বংশের মহিমময়ী সুদুর্লভা মেয়ে, আমি লোক-নিন্দা সমাজ-ভয় সমস্ত কিছুকে অবহেলায় অতিক্রম করে গোত্রহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, সত্যকামকে বরণ করে সত্যকাম-বংশ প্রতিষ্ঠা করব। এ আমিই পারি। এরই জন্যই এবার আমার নব জন্ম।

স্তব্ধ হয়ে গেল দিব্যেন্দু। আবারও কাঁদছিল সে। একটু পর ঘাড় নেড়ে সে বললে—না। তবু হয় না।

—হয়। কেন না?

—হয় না বিপাশা এইজন্য যে, যখন তোমার সন্তান তোমাকে প্রশ্ন করবে—বল মা, আমার সাত পুরুষের নাম বল। পিতামহের নাম? প্রপিতামহের নাম?

—বলব ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায়। ভগবান চট্টোপাধ্যায়। অথবা সত্য চট্টোপাধ্যায়। হঠাৎ থেমে বললে—কোর্টে আমি এ কথা তুলতে দেব না।

—কি করে আটকাবে?

—বলব অপরাধ আমার। তুমি আমার স্বামী, আমি কিন্তু অন্যে অনুরক্তা হয়েছিলাম—

—না—না—না! হতে পারে না। হতে দেব না। সত্য আমি বলবই।

—বেশ। তাই বলো। তবু আমি আমার কথা প্রত্যাহার করব না। তুমি আমার স্বামী। আমি তোমার স্ত্রী। তুমি পুরুষ, আমি নারী। তুমি সৎ, আমি সতী। তুমি পুণ্যবান, আমি পুণ্যবতী!

সে দিব্যেন্দুর হাতখানা বুকে তুলে জড়িয়ে ধরল।

দিব্যেন্দু কাঁদতে লাগল।

* * *

সেইদিনই বিকেল বেলা যখন সে এল, তখন তার অন্তর পরিপূর্ণ। এক গোছা ফুল নিয়ে এসেছে, সঙ্গে একটা ফুলদানীও এনেছে। সাজিয়ে দেবে। বইয়ের দোকান খুঁজে খুঁজে রবীন্দ্রনাথের তিনখানি কবিতার বই এনেছে। পড়বে দিব্যেন্দু এবং সে এসে শুনবে। তবে কাল-পরশুর মধ্যেই তাকে হাসপাতাল ডিসচার্জ করবে। তারপর কেস পর্যন্ত থাকতে হবে এখানে। পুলিসের কাছে খবর নিয়ে তার জামিনদারের নাম সে জেনে নিয়েছে। একজন বড় বাঙালী ব্যারিস্টার। মিঃ গুহ। তিনি নিজেই জামিন হয়েছেন, অথবা স্বামীজী নিযুক্ত করে গেছেন, তা ঠিক জানে না। তিনিও নিশ্চয় আসবেন। আসবেন নয়, ঘরে ঢুকে দেখলে, নিখুঁত স্যুটপরা একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বসে আছেন। বোধ করি তিনি ঢুকবার পরই সে ঢুকল। তিনি পিছন ফিরে তাকে দেখে বললেন—কয়েক মিনিট আপনাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলতে পারি? আমি এঁর ব্যারিস্টার—কিছু কথা বলব—

দিব্যেন্দু নমস্কার করে বললে—আপনি মিস্টার গুহ? নমস্কার। বসুন।

—নমস্কার! চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন তিনি।

দিব্যেন্দু বললে—উনিও থাকবেন। উনি বিপাশা দেবী—

সঙ্গে সঙ্গে বিপাশা পূরণ করে দিল—আমি ওঁর বাগ্‌দত্তা পত্নী।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন বিপাশার মুখের দিকে মিস্টার গুহ। বিপাশা একটু অস্বস্তি অনুভব করেও দিব্যেন্দুর বিছানার একপাশে বসল। ফুলদানীটা রেখে দিল টেবিলটার ওপর।

মিস্টার গুহ বললেন—আমিই আপনার জামিনদার। স্বামীজী—যে সন্ন্যাসী আপনাকে বাঁচিয়েছেন বলতে গেলে, তিনিই আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

দিব্যেন্দু বললে—জানি। আজও সকালে বলে গেছেন—মিস্টার গুহ তোমার জামীন আছেন। কেসেও তিনি ডিফেণ্ড করবেন।

—আমার আরও একটা পরিচয় দিতে পারি—যেটা আপনার জানা। বাইশ বছর আগে এখানে একটা কেস হয়েছিল—এলিস চ্যাটার্জি ভার্সাস শরদিন্দু চ্যাটার্জি। চার্জ ছিল চিটিং অ্যাণ্ড অ্যাডালট্রি। সে কেসে আমি শরদিন্দু চ্যাটার্জির পক্ষের কাউনসেল ছিলাম।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকালে দিব্যেন্দু। মুখে তার কোন কথা বের হল না। একটু পর সামলে নিয়ে সে বললে—তিনি—তিনি—

তার কথায় বাধা দিয়ে মিস্টার গুহ বললেন—তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন। বিলেতে একসঙ্গে ছিলাম প্রথম এক বছর। বলতে পারেন—একটা দল। সেমঁলট যাঁকে বলে। আমি সব জানি। আজ তিনি চেঞ্জড্ ম্যান। অবশ্য যে শিক্ষা, যে আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তাতে পাথরও বদলায়, গলে বোধ করি জল হয়।

তিনি বেঁচে আছেন?

কথার জবাব মিস্টার গুহ সরাসরি দিলেন না। বললেন—তিনি একটা স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন—কোর্টে এফিডেবিট করে স্টেটমেণ্ট আমাকে দিয়ে গেছেন। তার মধ্যে তিনি সব অপরাধ স্বীকার করেছেন। পুলিস আপনার হোটেলের রুম থেকে এলিস ভার্সাস শরদিন্দু চ্যাটার্জির মামলার যে নথিপত্র সংগ্রহ করেছে—কেস যদি গড়ায়ই তবে সেটা আমি দাখিল করব ওটার পরিপূরক হিসেবে।

দিব্যেন্দু উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল। প্রশ্ন করলে—তিনি কোথায়?

মিস্টার গুহ হেসে বললেন—উত্তেজিত হবেন না। তিনি আছেন। আপনি ফোর্টের দেওয়ালে যে কাগজগুলো মেরেছিলেন—"লাবণ্য দেবী—মা, তোমার ছেলে দিব্যেন্দু তোমাকে খুঁজছে"—সেই দেখেই তিনি আপনাকে চিনেছিলেন। এই খামটা ধরুন। ওই এফিডেবিট করা স্টেটমেণ্টের কথাই এতে আপনাকে সম্বোধন করে লিখেছেন। এ তাঁর কনফেশন। পড়ে দেখবেন। কিন্তু উত্তেজিত হবেন না। কাল আপনাকে ডিসচার্জ করবে। আমি হোটেল ঠিক করে রাখছি। আপনার বাগ্‌দত্তা এসেছেন—আমি নিশ্চিন্ত। আপনি ওঁর উপর নজর রাখবেন।

চিৎকার করে উঠল দিব্যেন্দু—মিঃ গুহ, বলে যান তিনি কোথায়?

—ওরই মধ্যে পাবেন।

—আমার মা?

—তিনি স্বর্গের দেবী। মিস্টার গুহ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন এবং বেদনার্ত কণ্ঠে বললেন—স্টেটমেণ্টে সবই আছে।

আকুল আগ্রহে কম্পিত হস্তে খামখানা ছিঁড়ে ফেললে দিব্যেন্দু!

নয়

তুমি আমার পুত্র, আমি তোমার পিতা। কিন্তু তোমার সামনে দাঁড়িয়ে সে কথা বলবার অধিকার আমার নেই; সাহসও নেই। সম্ভবত মৃত্যুর পর যদি পরলোক সত্য হয়, তবে তোমার প্রদত্ত পিণ্ডের জন্য আমার বিদেহী আত্মাও সম্মুখীন হতে সাহস পাবে না। আজ বেঁচে থেকেও ছদ্মনামের অন্তরালে ঘুরে বেড়াই। সংসার-জীবনে আমার নাম ছিল শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়।

হাসপাতালে তোমার পাশে বসে থেকেছি, তুমি যখন চেতনাহীন তখন কেঁদেছি, তোমার জ্ঞান ফিরলে বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করে সাহস সঞ্চয় করে বলতে চেয়েছি—সংসার-জীবনে আমার নাম ছিল শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তোমার মুখের দিকে চাইলেই তিলে তিলে সঞ্চয়-করা সাহস যেন শূন্যে বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে আতঙ্ক হয়েছে, এ কথা শুনলে তোমার ওই সদ্য শুকনো কণ্ঠনালীর ক্ষত আবার ফেটে যাবে, এবং আমার যে রক্ত নূতন করে তোমার দেহে সঞ্চারিত করা হয়েছে, নিদারুণ ঘৃণায় তা উদ্গীরিত হয়ে যাবে।

আমি তোমার পিতা—তুমি আমার সন্তান—আমার ঔরসজাত, আমার বিবাহিতা সতীসাধ্বী হিন্দু পত্নী লাবণ্যের পুণ্য গর্ভজাত। তুমি পবিত্র, তুমি শুদ্ধ, তুমি পুণ্যফল। আমি পাষণ্ড, আমি কামার্ত, রূপমোহান্ধ; শিক্ষা ও বৈদগ্ধ্যের প্রচ্ছদের অন্তরালে ছদ্মবেশী নরপশু। বোধ করি, বংশের মধ্যে ভাল ও মন্দের ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়—তার মধ্যে ওই মন্দটিই ছিল আমার জীবন-স্রোতের উৎস। আমি যেমন মন্দটি পেয়েছি, তেমনই তুমি পেয়েছ ভালোটি। এলাহাবাদে আমার সন্ন্যাস-গ্রহণের দিন আমি প্রতি বৎসর আসি স্নান করতে। গোপনে আসি, গোপনে যাই। কারণ, এখানে আমার অনেক লজ্জা। এবার এসে দেওয়ালে ওই লেখা দেখে চমকে গেলাম। "লাবণ্য দেবী! মা, তোমার ছেলে দিব্যেন্দু তোমাকে খুঁজছে।" সারি সারি। তোমাকে দেখেই চিনলাম। দেরি হল না। তুমি আমার ঔরসজাত—অবিকল আমার যৌবনের প্রতিমূর্তি। আমি আর ফিরতে পারি নি দিব্যেন্দু। তোমার সম্পর্কে একটা শঙ্কা, একটা নিদারুণ উৎকণ্ঠা আমাকে বিচলিত করেছিল। তোমার মুখ-চোখ, তোমার পদক্ষেপ আমাকে বলে দিয়েছিল, তুমি এমনি একটা কিছু করবে। যে ছেলে এমন করে সমাজ-সংসার কর্তৃক অপবাদ-লাঞ্ছিতা পরিত্যক্তা মাকে খোঁজে, পথের ধারে বসে থাকে—সে সেই মায়ের জন্য না-পারে কি? এবং সেই কারণেই তোমার সম্মুখীন হতেও পারি নি। শুধু তোমার পিছনে পিছনে ঘুরেছি। ঘুরেছি সর্বত্র। সেদিন কয়েক মিনিট, বোধ করি বিশ মিনিটের এদিক-ওদিকে, এটা ঘটে গেল। সেদিন তুমি কিছু আগে এসে-ছিলে সঙ্গমের ঘাটে। আমি যখন এলাম তখন—।

—হে ভগবান! যেন আর্তনাদ করে উঠল দিব্যেন্দু—আমি চিনতে পারলাম না?

—আমার মনে হয়েছিল। কি অদ্ভুত সাদৃশ্য। তোমার এই দাড়ী-গোঁফে—। আমি যাই—

আমি যাই দেখি—

—না। বিয়াস তুমি যেয়ো না। আমার মধ্যে একটা ক্রোধ জেগে উঠছে। বিয়াস, আমার মা—!

সে কাঁদতে লাগল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ছোট ছেলের মত কাঁদতে লাগল। তারপর বললে—বিয়াস, তুমি পড়, আমি শুনি।

বিপাশা পড়ে গেল।

ডাক্তার হাসপাতালে যখন বললেন—রক্ত চাই, কে রক্ত দেবে? আমি বললাম—আমি। ডাক্তার বললেন—সাধুজী, ওর গ্রুপের সঙ্গে মেলা চাই তো। আমি বলেছিলাম—দেখুন, ঠিক মিলবে। পরমাত্মা বলছেন মিলবে। মিলেছিল। আমি জানতাম যে!

যাক। এখন কোর্টে যা এফিডেবিট করেছি—যা আমার জীবন-সত্য, আমার দুর্বলতার, লজ্জার কথা, যা একদিন কোর্টে বলতে পারি নি—তাই আজ বলছি। যেদিন তোমার সতী-সাধ্বী মা আমাকে কলঙ্কলজ্জা ও জেল থেকে বাঁচাবার জন্য নিজে কলঙ্কিনী অপবাদ গ্রহণ করেছিলেন—সেদিন আমি চেষ্টা করেও বলতে পারি নি। বলতে পারি নি, আমি জন্ম-পাষণ্ড।

এমন পাষণ্ডের শিক্ষাতেও বোধহয় পাষণ্ডত্বের মোচন হয় না। এমন শিক্ষিত পশু সকল কালে সকল দেশেই ছিল এবং আছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কালের একটা বাতাস আসে, অথবা এমন কিছু একটা হয় বা আসে—যখন শিক্ষা সভ্যতা দর্শন সব যেন এর সহায়তা করে।

আমার প্রথম যৌবনে এমনই একটা কাল এসেছিল, হাওয়া বয়েছিল। অশিক্ষিতা বলে বিবাহিতা পত্নী ত্যাগ করে শিক্ষিতা পত্নী গ্রহণের একটা হিড়িক পড়েছিল। মুসলমান হয়ে তালাক দিয়ে স্ত্রী ত্যাগ করে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা এবং আবার শুদ্ধি করে হিন্দু হওয়ার চলনটা ওই সময়েই। বিবাহ করে বিলেত গিয়ে সেখানে আবার বিবাহ করার নীচতা আমাদের বরাবর ছিল—রবীন্দ্রনাথের প্রভাতকুমারের গল্পে পাবে, খোঁজ করলেও অনেক পাবে। এ সময় তার ঢেউটা বেড়েছিল। বিবাহিত জীবনে প্রেম বিস্বাদ হয়ে গেছে তখন। চন্দ্রমুখীর প্রেম খুঁজে বেড়াই। বিবাহের চেয়ে বড় যে প্রেম, তার স্বপ্নে মশগুল। সাহিত্যে যৌবনের পূজায় নারীর রূপ, নারীর দেহ-কোমলতা, তার কটাক্ষের উপকরণ সংগ্রহের ঢেউ উঠেছে।

আমার এক ধনী বন্ধু-পুত্র, তিনি পত্নী-ত্যাগ করে নবপত্নী গ্রহণ করলেন। আমি উৎসাহী সমর্থক এবং বরযাত্রী ছিলাম। বন্ধুর পিতা অনুতপ্ত হয়ে পরিত্যক্তা বধূকে অর্ধেক সম্পত্তি দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তা নেন নি। হাসিমুখেই বলেছিলেন—না।

এক বন্ধু অভিনেত্রী বিবাহ করলেন। তাতেও ছিলাম বরযাত্রী। রেজেস্ট্রি বিবাহ। খাতায় সাক্ষী হিসাবে সই আছে আমার। কিছু মানি-না'র কাল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। ইঙ-বোপের ঢেউ এসেছে। জীবনপাত্রে মদিরা পূর্ণ করে পান করে নাও আকণ্ঠ। হেসে নাও, দুদিন বই তো নয়। এই কালের মানুষ আমি, তার উপর পাষণ্ড। হয়তো জন্ম-পাষণ্ড। এবং সে সময় আমার মত অনেক বিদগ্ধ পাষণ্ড প্রকাশ্য রাজপথে ধুলো উড়িয়ে বেড়ায়। সব ঝুট হ্যায়।

যাক, অনুক্রম রেখে বলি। আমার বিচার তুমি করো। নিজের অন্তর্জ্বালা মোচন করো। ধৌত করে নিয়ো আমার চোখের জলে। আমার স্টেটমেণ্ট—তোমার বিচারের সময় তোমার কথার সঙ্গে একত্রিত করে তোমার জীবনকাহিনী সম্পূর্ণ করে নিয়ো।

---আমাদের বাড়ি বোধ হয় ছিল হুগলী জেলায়। পিতামহ দেশত্যাগ করেছিলেন। চাকরি হয়েছিল উপজীবিকা। বাপ-মায়ের এক সন্তান আমি। মানুষ আবাল্য কলকাতায়। ফরাসী ধরনে হাসি, বিলিতি ধরনে কাশি, কথা বলি বেঁকিয়ে, পরিহাস করে উড়িয়ে দি সবকিছুকে—ঈশ্বর চরিত্র সমাজ সংস্কার সব কিছু। সে বৈদগ্ধ্য আজও আছে। হয়তো বেড়েছে। কিন্তু সেদিন যেন এর রূপ ছিল আরও তীক্ষ্ণ, আরও সর্বনাশা। চরিত্রকে ভ্রষ্ট করে তখন বাহবা দিতাম আমরা নিজেরাই নিজেদের। আমি ওই বিদগ্ধ দলের একজন।

অবিদগ্ধেরা যখন চরিত্রহীনতার পথে হাঁটে, তখন তারা ভিড় বাড়ায় দেহব্যবসায়ের পল্লীতে। ডাকাতি করেও তারা নারীর অপমান করে। জবরদস্তি হরণ করে। আর বিদগ্ধেরা যখন চরিত্র-হীনতার পথে হাঁটে, তখন তারা ভদ্রজনের লক্ষ্মীর সংসারে রাবণের মত তপস্বীর ছদ্মবেশে দেখা দিয়ে সর্বনাশ করে। ইন্দ্রের মত গুরুর ছদ্মবেশ ধরে অহল্যাকে পাষাণী করে।

আমি বিদগ্ধ। তখন শিবপুর থেকে বি-ই পাস করেছি। চাকরি পেয়েছি রেলওয়েতে। বাবা-মা দুই-ই বিগত হয়েছেন। অর্থ কয়েক হাজার বাবা রেখে গেছেন। চাকরি করি। সন্ধ্যায় বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায় বসি, অট্টহাস্যে, কথার ফুলঝুরিতে মজলিশ হয়ে ওঠে সোমরস-গন্ধ-ভরপুর। কেটে যায় অর্ধরাত্রি। এক একদিন শেষ রাত্রি পর্যন্ত। ওঠবার সময় বলি—আনন্দম্! আনন্দম্! আনন্দম্!

এর উপর সুযোগ পেলাম বিলেত যাবার। সাহায্য করবেন রেলওয়ে কোম্পানি! খুশি হয়ে উঠলাম।

এরই মধ্যে তোমার মায়ের গান শুনলাম। দেখলাম। ভবানীপুরে আমার এক বন্ধু থাকতেন, তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। পাশের বাড়িতে অপরূপ কণ্ঠের গান শুনলাম। ঘরের জানলার খড়খড়ি ফাঁক করে দেখলাম। সে কন্যা অপরূপা মনে হল। মনে হল, এই কন্যাকে জীবনে না পেলে জীবনই বৃথা। তোমার মাতামহ মাত্র কয়েকদিন হল তখন বীরভূম থেকে ট্রান্সফার হয়ে কলকাতায় এসেছেন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। ভাড়া নিয়েছেন ওই বাড়ি।

এরপর —।

থাক। তোমার মায়ের আশ্চর্য বিস্ময়কর নিঃশব্দ আঘাতহীন আঘাত আমার পূর্বের আমি-কে যেন মুচড়ে দুমড়ে সব নিঃশেষ করে দিয়েছে, রেখেছে শুধু কাঁদবার শক্তিটুকু, আর হায় হায় করবার শক্তিটুকু! তাছাড়া তুমি আমার পুত্র। সে সব বিশদ বিবরণ থাক। তবে শেষ পর্যন্ত বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে মাতামহের সঙ্গে আলাপ করলাম! তাঁকে দেখেছ—জান। তবে সেকালের তাঁকে জান না। ছিলেন ইংরিজীনবীশ—তখন হচ্ছেন নতুন করে হিন্দুনবীশ দুই মিশিয়েছেন। বাক্যে পটু ছিলাম। বাক্য দিয়ে ঐক্যের গ্রন্থিবন্ধন বিস্তায় পারঙ্গম ছিলাম। তাছাড়া, ইংরাজী লেখাপড়ায় বিজ্ঞানেও দখল ছিল। এরই মধ্যে যেদিন তোমার মাকে দেখলাম—সেদিন সত্যই যেন আমি

আত্মহারা হয়ে গেলাম। এ কি অপরূপা মেয়ে! এ কি তার কণ্ঠস্বর! মনে হল, এই কন্যাকে না-হলে জীবন বৃথা, আমি বাঁচব না।

পাত্র হিসাবে (যে হিসাব করে পাত্র বিচারে—অবস্থা শিক্ষা স্বাস্থ্য) তার কোনটায় অযোগ্য ছিলাম না। সুতরাং বাধা পাইনি অগ্রসরের পথে—উৎসাহিতই হয়েছিলাম। তোমার মা না করেন নি। তিনি ছিলেন আশ্চর্য স্থির, তিনি এতটুকু আকর্ষণ করতেন না নিজের দিকে। ঈশ্বর-ভক্তি ছিল বেশী। ওঃ, সেইটি যদি না থাকত!

এই অবস্থায় দিব্যেন্দু, একদিন তোমার মাতামহের কাছে বন্ধু-মারফৎ জানালাম কথাটা এবং অনুমান করতে পার—সহজেই সম্মতি পেলাম। এর আগে একদিন তোমার মাকে বলেছিলাম—

—লাবণ্য, তোমাকে যদি বিবাহ করতে চাই, তবে তুমি মত দেবে তো?

লাবণ্য কোন কথা না বলে উঠে চলে গিয়েছিল।

তোমার মাতামহের মত যেদিন পেলাম, সন্ধ্যায় একটি সুযোগে বললাম—কি? আজ মত দেবে তো?

সে হেসে চলে গিয়েছিল এবং বলেছিল—নিশ্চয়।

অথচ সে ঘরে বান্ধবীদের মধ্যে চঞ্চলা ছিল—তোমার মামীরা অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই অবস্থায় পূজোর সময় তোমার মাতামহ গেলেন পুরী। তাঁদের অনুসরণ করলাম। তখন এমনই আমার আকর্ষণ যে, লাবণ্যকে না দেখলে থাকতে পারি নে। এই পুরীতে সমুদ্রতটে দুজনে দুজনের হাত ধরে বসে থাকতাম। অনুভব করতাম সেই শরাঘাতের জ্বালা—যাতে মহাকালের ধ্যানভঙ্গ হয়েছিল। মধ্যে মধ্যে হাত ছাড়িয়ে উঠে যেত লাবণ্য। বুঝতাম সে নিজেকে সংযত করছে। এরই মধ্যে একদিন যাওয়ার কথা ভুবনেশ্বর। সব ঠিক। হঠাৎ লাবণ্যের হল একটু জ্বর। যাওয়া বন্ধ হতে হতে হল না। আমাকে রেখে তারা গেলেন—সকালে যাচ্ছেন বিকেলে ফিরবেন। দিনের বেলা, কয়েকটা ঘণ্টা মাত্র—তার উপর আমি ভাবী জামাতা। সামনে কার্তিক মাস, পরে অগ্রহায়ণেই বিবাহ।

এই নির্জন সুযোগে দিব্যেন্দু, আমার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র বৈশাখের অপরাহ্ণে কালো মেঘের মত যেন ফুলে উঠল। নিজেকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারলাম না। লাবণ্য অসহায়, তার উপর সেও রক্তমাংসের গড়া মানুষ—আমি তার ভাবী স্বামী।

হয়তো সেদিন সে নির্জনতার মধ্যে তারও মনে রঙ ধরেছিল। তবু সে বিধানকে বিস্মৃত হয় নি। বলেছিল—চল, তবে মন্দিরে চল। সেখানে জগন্নাথকে সাক্ষী রেখে তাঁর প্রণামী মালা নিয়ে বদল করব। বিমলা মায়ের মন্দিরে গিয়ে প্রসাদী সিন্দুর নেব। সেই সিন্দুরের একটি ছোট্ট বিন্দু দিয়ে দেবে আমার সিঁথিতে। সেই হবে আমাদের বিবাহ। তারপর আমাদের বাসর। তাই করেছিলাম।

এবং বাড়ি ফিরে সারাটা দ্বিপ্রহর বাসর পেতেছিল সে।

দিব্যেন্দু, আমাদের সামাজিক বিবাহ হয়েছিল দু মাস পর—কার্তিকের পর অগ্রহায়ণে। সেই কারণে সামাজিক বিবাহের তারিখ থেকে তোমার জন্ম আট মাস পর।

লাবণ্য কোনদিন আমাদের সামাজিক বিবাহের উপর গুরুত্ব দেয় নি। তার কাছে আসল বিবাহ ছিল সেই জগন্নাথ সাক্ষী রেখে মন্দিরে বিবাহ।

সেই কারণে সে যখন কোর্টে সাক্ষী দেয়—। থাক, ক্রম-ভঙ্গ হচ্ছে।

এরপর চলে গেলাম বিলেত। লাবণ্য ফিরে গেল তোমার দাদামশায়ের কাছে।

বিলেতে কয়েকদিন যেতে-না-যেতে আপসোস হল। বিয়ে কেন করে এলাম। নিজেকে আজ জিজ্ঞাসা করি, এমন করে লাবণ্যকে বিবাহ করবার জন্য পাগল হয়েছিলাম কেন? বাঁধন পড়বার মত মন আমার ছিল না। বিলেতের স্বপ্নও তো সামনে ছিল—তবে? এক-একসময়ে মনে হয় আমি সত্যই তাকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু আমার পাশব প্রবৃত্তি বহু-ভোগের আকাঙ্ক্ষা আমার ভালবাসার চেয়ে শক্তিতে প্রবলতর ছিল। সেটা সত্য হোক বা না হোক দিব্যেন্দু, এটা নিশ্চিত সত্য যে, আমি বিলেত চলে যাব, কুমারী লাবণ্যকে অন্য কেউ বিবাহ করবে এ কল্পনা আমার সহ্য হয় নি। লাবণ্য আমার!

বিলেতে এসে ছ মাস যেতে না যেতে আমার মন বিদগ্ধ চরিত্রহীন বল্গাহীন ঘোড়ার মত ছুটতে লাগল। সাহেবীয়ানায় পুরনো বন্ধুরা হেরে গেল। মদ্যপানে পোক্ত হয়ে গেলাম। সঙ্গিনী নিয়ে সমুদ্রতটে সারাদিন পড়ে থাকতে ছিল সব থেকে শখ। তবে পড়াশুনায় ভাল ছিলাম। বৃত্তিও একটা পেলাম। এরই মধ্যে বাঁধা পড়লাম এলিসের সঙ্গে। এলিস আমার প্রফেসরের মেয়ে। তার নিন্দা করতে পারব না। কিন্তু ওরা স্বতন্ত্র জাত। আচার, আচরণ বোধ—সব আলাদা। এলিসকে নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছিল একজন ইংরেজ ছেলের সঙ্গে। এতেই হয়ে গিয়েছিলাম উন্মাদ। হিত-অহিত ন্যায়-অন্যায় কোন জ্ঞান রইল না। হয়তো প্রয়োজন হলে সেই ইংরেজ ছেলের সঙ্গে ডুয়েল লড়েও মরতে পারতাম। জ্ঞান ছিল না যে লাবণ্য আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। এই সময় চিঠি এল—সংবাদ এল তোমার জন্মের! মনে পড়ে গেল। মাথার চুল ছিঁড়েছিলাম। গোপন করব না—মনে মনে তোমাদের মাতা-পুত্রের মৃত্যু কামনা করেছিলাম। সারাটা দিন মদ্যপান করেছিলাম। তারপর অকস্মাৎ মনে হয়েছিল—তাই তো! যে মেয়ে বিবাহের পূর্বে আমাকে আত্মদান করেছে, সে অন্যকে করে নি তার প্রমাণ কি? এ পুত্র আমার তার প্রমাণ কি? জানতাম সম্পূর্ণ মিথ্যা। নিজেই প্রতিবাদ করেছি নিজের। কিন্তু আমার পাষণ্ড সত্তা তা শুনবে কেন? সে বললে—এই তো সুযোগ। এই যে সন্তান, এ তো প্রকৃত পক্ষে সাত মাসে। নামে আট মাস। কেন নেব দায়িত্ব? লিখে দিলাম তাই। উত্তর এল—আমরা আজ হইতে জানিব লাবণ্য বিধবা। তুমি আমাদের কাছে মৃত! হু-র-রে! বলে নিজের ঘরে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। দুটো ডাকে আর চিঠি আসে নি। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে এলিসের পিছনে ছুটলাম। এবং একদা তাকে বিবাহও করলাম।

দেশে এসে চাকরি নিয়েছিলাম উত্তর প্রদেশে। রেলেরই চাকরি। বেতন অনেক। সুখেই ছিলাম। এলাহাবাদে আমার খুব খাতির ছিল। স্ত্রী আমার বিদেশিনী শ্বেতাঙ্গিনী। আমি যেন বিজয়ী বীর। নিশ্চিন্তই ছিলাম—লাবণ্য বা তোমার দাদামশাই এ কথা প্রকাশ করবেন না। এমন অনেক আছে আমাদের দেশে। এদেশের হতভাগিনীরা স্বামীর সুখের পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে

লোকলোচনের অন্তরালে ভগবানকে ডাকে। বলে—এ জীবনের শেষ কর।

তার জন্য আমার আপসোস ছিল না। জীবন চলেছিল জোয়ারের নদীর মত। হঠাৎ ভাঁটা পড়ল।

তোমার বড় মামা রেলের চাকরে। তিনি বদলী হয়ে এসেছিলেন এলাহাবাদ। আমার তাঁকে মনে ছিল না। জীবনে একবার কয়টা দিনের জন্যে দেখা। অফিসার গ্রেডের লোক হলেও নীচের অফিসার। কে মনে রাখে? তাঁর মুখ, তাঁর নাম, কিছুই মনে ছিল না। কিন্তু তিনি চিনেছিলেন। তিনি লাগালেন আগুন। এ আগুন আমার প্রাক্তন। আমার কর্মফল। সে চিঠি লিখেই ক্ষান্ত হল না। বিয়ের ফটোগ্রাফও পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এলিস আমার সঙ্গে ঝগড়া করলে, কৈফিয়ৎ চাইলে। সেটা ১৯৩৫ সাল।

আমি অস্বীকার করলাম। তার সন্দেহ গেল না।

সে ফটোটা দেখিয়ে বললে—এ কে তবে? কস্তুরবাইন? ইয়োর রাধা? এলিসকে বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়েছিলাম, দেখে শুনে রাধার উপর সে ঘৃণা প্রকাশ করেছিল।

আমি সহ্য করতে পারি নি—তার গালে চড় মেরেছিলাম। বাস্, হয়ে গেল। ওদের প্রেম আছে, কিন্তু সে প্রেমে ক্ষমা নেই। অন্তত আমাদের দেশে যে ক্ষমা, তা নেই।

এরপর ওখানকার ইংরেজরা এক হল। এলিসের বাপ এল। এলিস মামলা করলে। এবং সাক্ষী মানলে তোমার মাকে। তোমার মা বলেছিলেন, আমি যাব না।

ব্যারিস্টার গুহ ছিলেন আমার পক্ষে। তিনি পথ খুঁজছিলেন। আমি তখন মরিয়া। বললাম—গুহ, পথ খুঁজো না। পথ পেয়েছি।

সে বললে—কি?

আমি রিভলভারটা বের করলাম।

সে ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে বললে—না।

শুধু তাই নয়, আমাকে ঘরে বন্দী করে রেখে দিল। তারপর একদিন বললে—আমি আজ বেনারসে যাচ্ছি। ঘুরে আসি, যদি পথ না পাই তো রিভলভারটা তোমার হাতে তুলে দেব।

সে তোমার মায়ের কাছে গিয়েছিল।

পরের দিন কেসের শেষ দিন।

ফিরে এসে বলেছিল—ঠিক আছে। তবে প্রমিস্ মি, যা বলব তাই করবে। বলেছিলাম—করব।

আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালাম। গুহ বললেন—লাবণ্য দেবী সাক্ষী দেন নি। তাঁর সাক্ষ্য সব থেকে জরুরী। তিনি এসেছেন—তাঁকে ডাকা হোক।

লাবণ্য এসে দাঁড়াল।

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল। গুহকে বিশ্বাসঘাতক ভাবলাম। ভাবলাম, পুলিসের ঘুষ খেয়ে অথবা তার প্রসাদলাভের জন্যে—

লাবণ্য তখন বলছে—না, ওঁর সঙ্গে যে বিবাহের অনুষ্ঠান আমার হয়েছিল—তা অসিদ্ধ। স্ত্রী-

লোকের আমাদের দেশে দুবার বিবাহ হয় না। তার দু মাস আগে আমার সঙ্গে অন্য একজনের বিবাহ হয়েছিল গোপনে। সাক্ষাৎ ভগবান তার সাক্ষী।

পুলিসের উকিল বললেন—তিনি কে? নাম কি?

লাবণ্য বললে—তিনি উনি নন।

—আপনি এঁর বাড়িতে এক মাস ছিলেন? কি অধিকারে?

লাবণ্য কম্পিত কণ্ঠে বললে—রক্ষিতার অধিকারে। নইলে—। আর সে বলতে পারেনি।

আমি, দিব্যেন্দু, চেতনা হারাই নি। জ্ঞান হারিয়েছিলাম। চোখে দেখেছিলাম, জগন্নাথের সেই মন্দির। সেই স্বর্ণচূড়া। তার মধ্যে লাবণ্য আর আমি। তার হাতে মালা—আমার হাতে মালা।

মামলার ফল জান।

কিন্তু তোমার মা? গুহের ইচ্ছা ছিল আমাদের সে আবার মিলিত করে দেবে। কিন্তু লাবণ্য ডক থেকে নেমে জনারণ্যে হারিয়ে গেল।

তার বাবা ভাই লজ্জায় কোর্ট থেকে চলে গিয়েছিল। তার জন্য অপেক্ষাও করে নি। লাবণ্য —সে-ও কারও জন্যে অপেক্ষা করে নি। তাই কি সে করে? তাকে তুমি মিথ্যা খুঁজতে গিয়েছিলে এলাহাবাদে জঘন্য পল্লীতে। সে কি তাই যেতে পারে? সে যথাস্থানে গিয়েছিল।

না—মরে নি।

সন্ন্যাসী হয়েছিলাম এর পর। আর কোন্ পথ ছিল বল?

হঠাৎ একদিন সন্ন্যাসের পথেই ওকে আবিষ্কার করলাম। কিন্তু সম্মুখে যেতে পারি নি। তাকে দেখলাম জগন্নাথে।

জগন্নাথের মন্দির-দ্বারে ভিক্ষা করত।

আমি সম্মুখে যেতে পারি নি। মস্তিষ্কের তার বিকৃতি ঘটেছে। ভাবে জগন্নাথ তার স্বামী। আজও তার তেজ বহ্নির মত। আমি একখানা ছোট বাড়ি করিয়ে পাণ্ডাদের টাকা দিয়ে বলে-ছিলাম—প্রভুর স্বপ্নাদেশে সেবাইত পুরীর মহারাজা তাঁর জন্য এই বাড়ি করিয়ে দিয়েছেন। আবেদন করেছেন, ওখানেই তাঁকে থাকতে হবে। মন্দির থেকে প্রসাদ যায়। কিন্তু আমি তার সম্মুখে যেতে পারি নি। সে মুহূর্তে যা সম্মুখে পাবে, তাই দিয়ে নিজেকে আঘাত করবে।

তুমি পার তো তোমার মাকে ফিরিয়ে এনো।

আমার শেষ। আমাকে খুঁজো না। পাবে না।—

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়।

দশ

এক মাস পর।

পুরীর সমুদ্রতীরে এসে দাঁড়াল বিপাশা এবং দিব্যেন্দু।

কেসে দিব্যেন্দু খালাস পেয়েছে। বিচারক সাবধান করে ছেড়ে দিয়েছেন। তারা সর্বাগ্রে

এসেছে পুরীতে।

পাণ্ডা বললে—এই বাড়ি।

ছোট্ট সুদৃশ্য একখানি একতলা বাড়ি। দরজাটি বন্ধ।

ভিতরে গান গাইছিল কেউ নারীকণ্ঠে। মীরার ভজন।

অপূর্ব সে সঙ্গীত। অপূর্ব সে আত্ম-নিবেদন।

গান শেষ হতেই দিব্যেন্দু বললে—ডাকুন।

—না বাবু। একদম পাগল। চিৎকার করে উঠবে। নিজেকে জখম করে ফেলবে। ঘরের মধ্যে যখন গান করেন তখন বেশ। কিন্তু বাইরে এলেই উন্মাদ।

—তবে?

—চলুন, ফিরে চলুন বাবু। হোটেলে চলুন। ও আর কি দেখবেন?

—কেন?

—পাগল। ওই—ওই বের হচ্ছেন বাবু মাতাজী। সরে আসুন।

বলতে বলতেই দরজা খুলল। হাতে একটা ভাঁড়—সে এক অর্ধ-নগ্নিকা, মুণ্ডিতকেশা, কঙ্কালসার নারী, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। নগ্নতার জন্য লজ্জা নাই। ভাঁড়ের ওই জল ছিটিয়ে পা দিয়ে দিয়ে বের হয়ে এল। হঠাৎ বসল। তারপর কাতর করুণ কণ্ঠে বলে উঠল—আঃ—মানুষকে ভজলে কলঙ্ক হয়, ভগবানকে ভজলে পাথর হয়। পৃথিবী অশুচি হয়। আমার কি হবে গো! আমি কি করব গো!

ছুটে গেল দিব্যেন্দু—মা—মা—মা! সঙ্গে সঙ্গে বিপাশা। বেদনায় দর দর ধারায় তার চোখে জলধারা বইছিল।

অর্ধনগ্নিকা চমকে উঠল, তারপর বিদ্যুদ্বেগে উঠে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকল এবং সশব্দে দরজা বন্ধ করে চিৎকার করে উঠল—ছুঁয়ো না। আমাকে ছুঁয়ো না। না—না—না!